কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

অক্টো-নভেম্বর ৮২

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন সুজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

ডাক্তারী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের শারীরিক চিকিৎসাও চলতে লাগল
আপনার এরকম অনিয়ম আর পরিশ্রম এ রোগ সারার পক্ষে প্রতিকূল
দীর্ঘকাল চিকিৎসার পর
আমি তো আমার যথাসাধ্য চেষ্টাই করলাম — আমার মনে হয় ডাক্তারীপড়াটা আপনার সহ্য হচ্ছে না।
আজ থেকে আমার ডাক্তারী পড়া এখানেই ইতি, এবার থেকে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়া শুরু করবো, দেখা যাক কি হয়
জগদীশচন্দ্র ভর্তী হলেন কেম্ব্রিজে। কিন্তু এতেও তার জ্বরের হাত থেকে নিস্তার নেই।
আমার মনে হচ্ছে, এটা আপনার আসামের এ দুরারোগ্য কালাজ্বর। যার কোন প্রতিশেধক এখনও বের হয় নি।
বুঝেছি, এভাবে তোয়াজ করে কোন কাজ হবে না! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর-

চিঠিপত্র

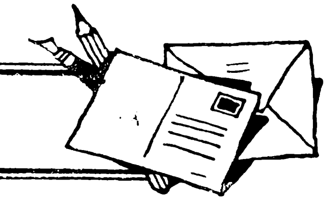

বিচিত্র উদ্ভিদ

সেপ্টেম্বর '৮২ সংখ্যার কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত ডঃ তারকমোহন দাসের "জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ" (বিচিত্র উদ্ভিদ) রচনাটি পড়লাম। তিনি ৪২ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ১২ লাইনে লিনিয়াসের শ্রেণীবিভাগটিকে লিখেছেন "প্রাকৃতিক শ্রেণী বিভাগ বা Natural System of Classification." কিন্তু প্রাকৃতিক শ্রেণী বিভাগ করেছেন জর্জ বেন্থাম ও জোসেফ ডালটন হুকার, লিনিয়াস কৃত্রিম প্রণালীতে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। এই ত্রুটিটি পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন হবে কি ? **বিবেকানন্দ ঘোষ**
ইছাপুর, বাপুজী কলোনী, চব্বিশ পরগনা।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৫৫ পাতায় শুভব্রত রায়-চৌধুরীর ভেবে ভেবে বলো পড়ে আমার খুব ভাল লাগলো। কিন্তু মহাশয় আমার এতে একটি প্রশ্ন আছে। শুভব্রত রায়চৌধুরীর ভেবে বলার প্রশ্নে ৫ নম্বরে গুণটি যথা $\frac{\times\times\times\times\times}{\times\times\times\times\times}=\frac{1}{4}$ কিন্তু শুভব্রত রায়চৌধুরীর ভেবে বলার উত্তরে ৫ নম্বরে উপরে ৪টি সংখ্যা এবং নিচে ৫টি সংখ্যা দেওয়া আছে যথা $\frac{4392}{17568}$ কিন্তু শূন্যস্থানের উপরে ৫টি × কাঠি এবং নিচে ৫টি × কাঠি দেওয়া আছে। ইহার কারণটা কি ? এই উত্তর ছাড়া আর কোন উত্তর দেওয়া যায় না ? **অসীম কুমার শীল**
গ্রাম + পোঃ-অকাল পোষ, জেলা-বর্ধমান।

হ্যালির ধূমকেতু

আপনাদের প্রকাশিত 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' সেপ্টেম্বর —৮২, সংখ্যায় অসিত কুমার চক্রবর্তীর রচিত 'সংবাদ' এর মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা পড়ে ভালই লেগেছে।

লেখক হ্যালির ধূমকেতুকে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে আবার দেখা যাবে বলে লিখেছেন। কিন্তু আমি আপাতত বিজ্ঞানের নানান বই, পাঠ্য বই ইত্যাদিতে ১৯৮৫ সালে আবার দেখা যাবে বলে পেয়েছি। এছাড়াও ১৯১০ সালের সঙ্গে ৭৫ যোগ করলে ১৯৮৫ হয়।

ইতি—**পবিত্র পাল**
ডিব্রুগড় বঙ্গীয় উচ্চ বিদ্যালয়, নবম শ্রেণী, ডিব্রুগড়, আসাম।

প্রসঙ্গ ঃ নেপচুনের আবিষ্কর্তা

জুলাই, ৩য় সংখ্যায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত আমাদের পত্রে 'নেপচুন'-এর আবিষ্কর্তা লিভেরিয়ার (Leverrier)-এর নাম প্রকাশ করায় অমরনাথ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

তিনি আমাদের কাছে কোন Reference বই আছে কিনা জানতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, আমাদের কাছে Reference বই আছে। বইটার নাম 'শিশু-ভারতী'। বইটি অনেক দিন আগেকার ; তাই বইটির সামনের দিকে কতগুলি পৃষ্ঠা নেই। আর সেই জন্যই বলতে পারলাম না বইটা কবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটায় ৩৭৬৫ থেকে ৩৭৬৯ পৃষ্ঠার মধ্যে 'নেপচুন' আবিষ্কারের কাহিনী সুন্দরভাবে লেখা আছে এবং লিভেরিয়ারকে নেপচুনের আবিষ্কারক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বইটাতে আরও দেওয়া আছে লিভেরিয়ার ও অ্যাডামস (Adams)-এর পূর্বেও ১৭৯৫ সালের ৮ই মে বার্লিনের জন ল্যালেনডি (John Lalande) নেপচুন-কে দেখতে পেয়েছিলেন। এমন কি এও দেওয়া আছে 'নেপচুন'-কে ২০১০ সালে দেখা যাবে।

নমস্কারান্তে—
বিপ্লব মোহান্ত, পল্লব মোহান্ত, মলয় মোহান্ত, শুভাশীষ মণ্ডল, দেবাশীষ মণ্ডল, শম্পা মণ্ডল।
গ্রাম + পোষ্ট-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।

সম্পাদক মহাশয়,

সেপ্টেম্বর '৮২ সংখ্যায় খড়্গপুরের অমরনাথ রায় লিখেছেন The Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে আছে নেপচুন আবিষ্কারের সুসংবদ্ধ কাহিনী, কিন্তু বইটির কোথাও চূড়ান্তভাবে লেখা নেই যে Leverrier ই নেপচুনের আবিষ্কর্তা। তিনি আরও বলেছেন নেপচুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে Adams ও Leverrier উভয়েরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি বলেছেন এ' বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন Reference বই আছে কিনা যাতে Leverrier-কে নেপচুনের আবিষ্কর্তা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলি দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটদের বুক অব নলেজ নামক বইয়ে ১৫৬ পৃষ্ঠার প্রথম সারির ১৮৪১ খ্রীঃ থেকে তা আর হল না, এই অংশের মধ্যে স্পষ্টভাবেই বলা আছে Leverrier-ই নেপচুন আবিষ্কর্তা।

কিংশুক মুখার্জী (১২ বৎসর)।
৩১, প্রফুল্লনগর, পোঃ-প্রফুল্লনগর, জেলা-২৪ পরগনা।

সংবাদ

প্রকৃতি পাঠের আসর

বিগত বছরগুলির জয়ন্তী ('৭৯), শিরকাবাদ ('৮০) ও ম্যাকল্যাস্কিগঞ্জ ('৮১) এর শিবিরগুলির মতো এ বছরও ২৫শে ডিসেম্বর '৮২ থেকে ২রা জানুয়ারী '৮৩ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার রেলিখোলাতে (শিলিগুড়ি থেকে ৪০ কিমি এবং তিস্তাবাজার থেকে ১০ কিমি আগে, কালিম্পং পাহাড়ের নীচে) ইয়ুথ হস্টেলস্ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া আয়োজিত চতুর্থ রোমাঞ্চকর প্রকৃতিপাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবির স্থানের কাছাকাছি তিস্তা ও তার শাখা নদী রিয়াখোলা ও রেলিখোলার সংগমস্থল। এবারের শিবির বসবে ৭ দিনের জন্য। ১০ থেকে ১৪ বছরের বালক বালিকারা এই শিবিরে যোগ দিতে পারবে। যোগদানের খরচ মাথাপিছু (রেল ও বাসভাড়া বাদে) ৭৫.০০ টাকা। আবেদন পত্রের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইয়ুথ হস্টেলস্ এসোঃ অব ইণ্ডিয়া

৭৭, সাদার্ন এভেন্যু, কলি-২৯ রবিবার সকাল ৯-১২টা।

আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ

গত ৫ সেপ্টেম্বর সুরসুনায় আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ ও আলোকবর্তিকা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং ডঃ তারকমোহন দাস। প্রারম্ভে আলোকবর্তিকার পক্ষ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ মুনসী এবং বিজ্ঞান সংসদের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর বসু ও অরুণ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য সত্যেন বসুর স্মৃতিচারণা করে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সংসদের কর্মপ্রয়াসকে অভিনন্দন জানান। ডঃ সেনশর্মা পরিবেশ দূষণ ও জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ডঃ দাস আকর্ষণীয় স্লাইড সহযোগে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন উৎস ও তার প্রতিকার বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনায় সকলকে মুগ্ধ করেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সেপ্টেম্বর-৮২ সংখ্যায় ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়ের 'ঘড়ির অঙ্ক' শীর্ষক নিবন্ধে ৩০ পৃষ্ঠায় নবম লাইনে (ওপর থেকে) OX-এর পরিবর্তে 0× পড়তে হবে; এবং নিবন্ধটির শেষাংশে এই কয়েকটি লাইন যুক্ত হবে—এ বিষয়ে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন (1879—1955) তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে কিছু জ্ঞানগর্ভ এবং চিত্তাকর্ষক আলোচনা রেখে গেছেন তিনি বলেছেন যে, গতিশীল যানে একটি ঘড়ি যে সময় দেবে তা স্থির অবস্থায় থাকার সময়ের থেকে মন্থর হবে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বৈপ্লবিক চিন্তাটি স্মরণ করে ঘড়ির অঙ্ক বিষয়ক বর্তমান নিবন্ধটি সমাপ্ত করা যাক।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

২য় বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ॥ ১৯৮২

অক্টোবর-নভেম্বর যুগ্ম সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

পুজোর ছুটি প্রায় শেষ। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। তোমরা সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবে—এটাই আশা করছি। তোমাদের সকলেরই কাজে লাগবে—এই রকম একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায় 'উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ প্রক্রিয়া।' অমরনাথ রায়ের 'জীবনদায়ী গ্যাস' অক্সিজেন লেখাটি তো তোমাদের ভাল লাগবেই। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগের সংগে আর একটি নতুন বিভাগ এই সংখ্যা থেকে শুরু করা হল। এই বিভাগে তোমরা নিয়মিত সিদ্ধার্থ ঘোষের নানারকম বুদ্ধির খেলার খবর জানতে পারবে—যিনি শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'ম্যাজিক কার্ড' লিখে হৈহৈ ফেলে দিয়েছেন।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা অনেকেই গতবারের মতো এবারেও 'সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী' পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছে। আমরাও লেখকদের তাড়াতাড়ি লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেছি। জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী' প্রকাশ করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

॥ সূচীপত্র ॥

চিঠিপত্র : ১
সংবাদ : ২
সম্পাদকীয় : ৩

দপ্তর থেকে
প্রবাল নিয়ে ভাবনা : সমরজিৎ কর ৪

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ২১

গল্প
পোকা : শ্রীধর সেনাপতি ১২

পড়াশোনা
তাপ সংদীপ্তি : অলক চক্রবর্তী ১৭
জীবনদায়ী গ্যাস অক্সিজেন : অমরনাথ রায় ২৮
উৎপাদক সাহায্যে ভাগ প্রক্রিয়া : অসীম মুখোপাধ্যায় ৩৫

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
প্রাণীবিজ্ঞানী : ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী : মিহির ভট্টাচার্য ৮

পশুপাখীর গল্প
পৃথিবীর এক দ্রুততম সাপ : অমৃত গুপ্ত ৩৩
অলক্ষ্যে যারা অবলুপ্ত হতে চলেছে : ধীরেন দত্ত ৩৯

নিজে কর
টেলিগ্রাফ : জয়দেব বসাক ৫৪

বিজ্ঞানের বিস্ময়
মিনি শ্যাট্‌ল্—চ্যালেঞ্জার : অমিতাভ সেন ৫৫

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
ফটোমাইক্রোগ্রাফি : অনির্বাণ চক্রবর্তী ৩৪
রসায়নে নীল : বিবেক রায় ৬
লাল গ্রহ—মঙ্গল : বিমান বসু ৪৬
পোকা থেকে গাছ : সুশীল মুখোপাধ্যায় ২৫
বাজ, বিদ্যুৎ, বেঞ্জামিন : রত্না ঘোষ ৪১
পৃথিবীতে তুষারযুগ : সুনীত রায় ৯

বিজ্ঞানের ভেল্কি
ম্যাজিক মোমবাতি : এ. সি. সরকার ১৯
ম্যাজিক কার্ডের কারসাজি : সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫২

ছবিতে গল্প
টোয়েণ্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী : গৌতম কর্মকার : ৭
বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস : প্রচ্ছদ : ২, ৩
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ৪৫
ছবির মজা : প্রণব হোড় ২৭
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা : ধীরেন বল ৫৬

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম ৫৭
শব্দ সন্ধানের উত্তর : ৫৯
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : ৫৯
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর ৫৯
আবদুল কাকার গল্প : মানসী দাস ৬০
ভেবে উত্তর দাও : শুভেন্দু ভট্টাচার্য ৬৩
রহস্যময় নিরুদ্দেশ : সিদ্ধার্থ ঘোষ ৬৪

প্রবাল নিয়ে ভাবনা

সমরজিৎ কর

এক ধরনের তারামাছ নিয়ে এখন বেশ চিন্তিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তোমরা তো জানই, পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে নানারকম তারামাছ পাওয়া যায়। আমি যে মাছটির কথা বলছি তার বৈজ্ঞানিক নাম 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি।' শয়তানই বলতে হয়। এদের গায়ে থাকে খুরের মত ধারালো কাঁটা! হাতে চামড়ার দস্তানা পরে যে ধরবে তারও জো নেই। একটু অন্যমনস্ক হলে এদের কাঁটা দস্তানা ফুঁড়ে হাতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। সেই ক্ষতই অসহ্য ব্যথা। তার সঙ্গে বমন। অনেক সময় সারা দেহ পঙ্গুও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যদি সত্যিই এইভাবে তাদের বংশ বৃদ্ধি চলে, হয়ত এক সময় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে প্রবাল কীট।

ভাবছো, কি করে তা সম্ভব? কেনই তা হবে?

তা হলে বলি, শোন। 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি' প্রবাল কীট শিকারের ব্যাপারে দারুণ সিদ্ধহস্ত। আবার খাবার হিসেবে এই কীট তাদের কাছে—যাকে বলে এক নম্বর লোভনীয় খাবার।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তা সাগরের জলে এমন খেয়োখেয়ি তো সব সময়ই চলে। এতো প্রাকৃতিক ঘটনা। বর্ষার গোড়ায় পাখনাওয়ালা পিঁপড়ে ওড়ে। তাদের সাবাড় করে টিকটিকি, চামচিকে—আরও কত প্রাণী। ক্ষেত খামাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বংশ বৃদ্ধি করে ধাড়ি ইঁদুর। তাদের সাবাড় করে সাপ, প্যাঁচা প্রভৃতি। আর তা করে বলেই ওদের হাত থেকে আমরা রেহাই পাই। কিন্তু তাই বলে খাদকের আক্রমণে একেবারে তারা নিশ্চিহ্ন হবে—এ কখনও হয়? সাগর মহাসাগর আর তো ছোটো খাটো জায়গা নয় যে সেখানকার ওই রাক্ষুসে তারামাছগুলি সাবাড় করবে সমস্ত প্রবাল কীট?

কথাটা সত্যি। ওদের আক্রমণে পুরো প্রবালকুল ধ্বংস হবে এমন অবশ্য কথা নয়। তবে এ পর্যন্ত যতটা ক্ষয়-ক্ষতি করেছে তাতে বিজ্ঞানীরা কিন্তু সত্যিই আতঙ্কিত।

যেমন, ধরো, এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ'-এর প্রায় ১৪০ মাইল অংশ এখন নিশ্চিহ্ন। এটি একটি দীর্ঘ প্রবাল প্রাচীর। যেটুকু নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেটুকু মূল প্রাচীরের চার ভাগের এক ভাগ। এই মহাশয় প্রাণী এবার প্রশান্ত মহাসাগরের বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। মানে ওই তারামাছ। ব্যাপার স্যাপার দেখে সামুদ্রিক-প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি এইভাবে চলে অদূর ভবিষ্যতে বহু প্রবাল প্রাচীর এবং প্রবাল শৃঙ্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রবাল কীট মাড়া পড়ায় নতুন করে যে প্রবাল প্রাচীর গড়ে উঠবে তারও জো থাকবে না। অনেক দ্বীপ অথবা দ্বীপপুঞ্জ ঘিরে রাখে প্রবাল প্রাচীর। ওই সব প্রাচীর সেই দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হলে দ্বীপগুলির গায়ে এসে ধাক্কা মারবে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক জলজ প্রাণী প্রবাল প্রাচীর এবং প্রবাল শৃঙ্গের ফাটলে আশ্রয় নেয়। ঘর বাঁধে তাদের গায়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই সব প্রাণীও।

বছর বারো আগে একটি সংবাদে বলা হয়েছিল, গুয়াম দ্বীপের উপকূল বরাবর দীর্ঘকাল ধরে বিচরণ করে আসছিল প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা একটি প্রবাল কীটের ঝাঁক। এখন সেই ঝাঁকের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই নিশ্চিহ্ন। আর তার কারণ ওই 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি'।

প্রাণী বিজ্ঞানীরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, মাঝে মাঝে কোন কোন প্রাণীর সংখ্যা বাড়ে অথবা কমে। কিন্তু 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি'র সংখ্যা বৃদ্ধির যেন তুলনা নেই।

ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ে ১৯৬৩ সালে লোহিত সাগরে। বিশেষজ্ঞদের নজরে পড়ল, ওই অঞ্চলে প্রবালের ঝাঁক কমেছে। তার জন্য দায়ী ওই তারামাছ। ১৯৬৬ সালে অনেকে এই ঘটনাটি সমর্থন করে জানালেন অস্ট্রেলিয়ার 'গ্রেট বেরিয়ার রিফে'র ধ্বংসের মূলেও ওই একই কারণ। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ওই তারামাছ ধ্বংস করছে সেখানকার প্রবালকীট। ফলে প্রবাল প্রাচীরের যেটুকু ক্ষয় হচ্ছে সেটা আর পূরণ হচ্ছে না।

ওঁরা এটাও লক্ষ্য করলেন, আরও নানারকম জলজ প্রাণীও অবশ্য প্রবাল কীট খায়। তবে ভক্ষণের ব্যাপারে 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি'র সঙ্গে কেউ পাল্লাই দিতে পারে না। কাজটিও তারা করে বেশ সহজেই। 'অ্যাকানথাসটার প্লানসি' শিকারের সময় তাদের মুখের ভেতর দিয়ে 'পাচক থলিটি' ছড়িয়ে দেয় সন্তরণরত প্রবালের ঝাঁকের উপর। কতকটা জেলের জাল ফেলার মত। তারপর প্রবালের নরম মাংস ভক্ষণ করে অন্যত্র চলে যায়।

সাধারণত রাতের দিকেই খাবারের কাজটি সারে তারা। তবে প্রবাল প্রাচীর ঘিরে প্রবাল কীটের ভিড় যদি বাড়ে, এ কাজ দিনেও করে তারা। প্রবালে দেহ নিঃসৃত এক ধরনের সামগ্রী ওই তারামাছের ক্ষুধার তাড়না বাড়ায়।

কত বড় এই তারামাছ ?

গুয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের বিবরণে জানা গেছে, এই তারামাছ দৈর্ঘ্যে কখনও কখনও ষাট সেন্টিমিটারও হয়। ব্যাস চব্বিশ সেন্টিমিটারের মত। এদের রাক্ষুসে হাঁ তিনশ' আটাত্তর বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা জুড়ে যতগুলি প্রবালকীট থাকে এক নাগাড়ে তাদের সাফ করতে পারে।

১৯৬৭ সালে এই তারামাছ গুয়াম অঞ্চলের প্রায় সব জায়গায় চোখে পড়েছিল। ১৯৬৮ সালে এদের কবলে পড়ে টুমোন উপসাগরের সমস্ত প্রবালই মারা যায়। ওই বছর নভেম্বর মাসে গুয়ামের কাছাকাছি নব্বই হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে ডুব দিয়ে ৮৪৬টি তারা মাছ শিকার করেছিল ডুবুরীরা।

এর কিছুদিন পর ওই অঞ্চল ছেড়ে তারামাছগুলি সরে পড়তে থাকে। যাবার পথে ধ্বংস করে বেশিরভাগ প্রবাল কীট। প্রবাল প্রাচীরেরও ক্ষতি হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাইওয়ানের শতকরা ৭০ ভাগ প্রবাল প্রাচীর। কয়েকটি মনোরম প্রবাল প্রাচীর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভ্রমণবিলাসীদের টেনে আনতো। এখন তারা অদৃশ্য। এই তারামাছ এখন প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর ধরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মকরক্রান্তি রেখা বরাবর সমস্ত প্রবাল প্রাচীর এখন ধ্বংসের সম্মুখীন।

হঠাৎ কেন এমন বাড়বাড়ন্ত ঘটল এই তারামাছের ?

এ প্রশ্নের সত্যিকারের উত্তর এখনও জানা যায় নি।

হাঙ্গরের খাদ্য ওই তারামাছ। অনেকে মনে করছেন, মানুষ প্রচুর পরিমাণ হাঙ্গর শিকার করছে বলে ওই তারামাছের সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া প্রবালভুক ওই তারামাছের বড় শত্রু এক ধরনের সাগর-শামুক। নাম 'ক্যারেনিয়া ট্রাইটোনিস।' একদল লোক এই শামুকের খোলা সংগ্রহ করে দু' পয়সা কামিয়ে নিতে ব্যস্ত। এদের খোল দেখতে সুন্দর। বাজারে তাই বড় কদর। ফলে বড় শত্রু কমে যাওয়ায় তারামাছের এখন বাড়বাড়ন্ত। কারণ হয়ত আরও আছে। শুধু আসল কথা এই, মানুষের হস্তক্ষেপ প্রকৃতির কেমন ক্ষতি করে প্রবালের ধ্বংস তার একটি বড় রকম উদাহরণ বলে মনে হয় না ?

সমরজিৎ করের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের

স্বাদু ও রম্য জীবন চরিত

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী—১৫·০০

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

রসায়নে নীল

বিবেক রায়

তোমরা অর্থাৎ যারা রসায়ন বিজ্ঞান পড় এবং রসায়নাগারে হাতেকলমে অনেক পরীক্ষা কর, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নীল রঙের যৌগ উৎপন্ন হয়। সব নীল রঙ ঠিক এক রকমের নয়। নীলের আবার রকমফের আছে। কোনটা ফিকে নীল, কোনটা গাঢ় নীল। বিভিন্ন রকম নীল রঙের নামও আলাদা। রঙের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও বৈচিত্র্য আছে। কোনটার নাম 'টার্নবুল্‌স ব্লু', কোনটার নাম 'প্রুসিয়ান ব্লু', আবার কোনটার নাম 'মলিবডেনাম ব্লু'।

এখন আমি কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উল্লেখ করছি যাতে কেবল নীল রঙের যৌগই উৎপন্ন হয়। রসায়নাগারে তোমরা এই পরীক্ষাগুলো করে বিভিন্ন রকমের নীল রঙ উৎপন্ন ক'রে আনন্দ উপভোগ করতে পার।

প্রথমেই বলি আয়োডিনের স্টার্চ-টেস্টের কথা। একটা পরীক্ষা নলে কিছুটা স্টার্চ দ্রবণ নিয়ে তাতে এক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ ফেল। অমনি পরীক্ষা নলের দ্রবণটি গাঢ় নীল হয়ে যাবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ঐ দ্রবণকে তাপ দিলেই নীল রঙ উবে যাবে। দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলে আবার সেই গাঢ় রঙ ফিরে পাবে।

এবারে একটা পরীক্ষা নলে ফেরাস সাল্‌ফেটের দ্রবণ নাও। তাতে একটুখানি পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড দ্রবণ যোগ কর। অমনি দ্রবণটি নীল হয়ে যাবে। এই নীল রঙের নাম 'টার্নবুল্‌স ব্লু'।

ফেরাস লবনের বদলে যদি তুমি পরীক্ষা নলে কোন ফেরিক লবনের দ্রবণ নিয়ে তাতে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড দ্রবণ ঢাল তাহলে যে নীল রঙ পাবে, তার নাম 'প্রুসিয়ান ব্লু'।

তুঁতে বা কপার সালফেটের দ্রবণ একটি বীকারে নিয়ে তাতে যদি তুমি বেশী পরিমাণে 'লাইকার অ্যামোনিয়া' যোগ কর তাহলেও গাঢ় নীল রঙ পেয়ে যাবে।

এবার বীকারের মধ্যে 'অ্যামোনিয়াম মলিবডেট' নিয়ে তাতে 'স্ট্যানাস ক্লোরাইড' ঢেলে প্রথমোক্ত যৌগটিকে বিজারিত করলেই একটা নীল রঙ পাবে, যার নাম 'মলিবডেনাম ব্লু'।

পরীক্ষা নলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে ডাই ফিনাইল অ্যামিনের দ্রবণ নিয়ে তাতে নাইট্রিক অ্যাসিড অথবা কোন নাইট্রেট লবনের দ্রবণ যোগ কর। অমনি পেয়ে যাবে গাঢ় নীল রঙ।

রসায়নাগারে আরও অনেক উপায়ে তোমরা নীল রঙ পেতে পার। যেমন ধর, কোনও সেকেণ্ডারী অ্যামিনের সঙ্গে নাইট্রাস অ্যাসিডের অথবা কোনও নাইট্রাইট লবনের দ্রবণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে 'নাইট্রোসো অ্যামিন' উৎপন্ন করে নাও। ঐ নাইট্রোসো অ্যামিনের সঙ্গে একটুখানি ফেনল এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে তারপর তাতে কস্টিক সোডা মিশিয়ে দ্রবণকে ক্ষারীয় করা মাত্রই নীল রঙ পেয়ে যাবে।

এবারে আসি ব্লু-প্রিন্টের কথায়। ফেরিক অ্যামোনিয়াম সাইট্রেট এবং পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের দ্রবণ একত্রে নিয়ে মসৃণ সাদা কাগজের ওপর লেপে কাগজটিকে অন্ধকারে শুকিয়ে নাও। তাহলেই কাগজটা আলোক সুবেদী হ'য়ে উঠবে। কাগজটির ওপর এইবার আলোক রশ্মি ফেলে সেটিকে জলে ভাল করে ধুয়ে নাও। অমনি কাগজের নীল পশ্চাদ্‌পটে আলোক রশ্মির সাদা দাগ ফুটে উঠবে।

সব শেষে যে নীল রঙের যৌগ উৎপাদনের কথাটি বলব তার নাম 'আলট্রামেরিন'। এটি উৎপাদন করতে হলে দরকার চীনা মাটি, গন্ধক, সোডা, বালি (সিলিকা) রজন আর অবিশুদ্ধ সোডিয়াম সালফেট (যার অপর নাম 'সল্ট কেক')। এই উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে একটি বড় মুচীতে (ক্রুসিবল্) নিয়ে গরম করলেই নীল রঙের 'অ্যালট্রামেরিন' যৌগ পেয়ে যাবে।

এবারে তোমরা খুঁজে দেখ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তার কোনও নীল রঙের যৌগ উৎপন্ন হয় কিনা।

জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী / লেখা ও ছবি : গৌতম কর্মকার

প্রাণীবিজ্ঞানী

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

মিহির ভট্টাচার্য

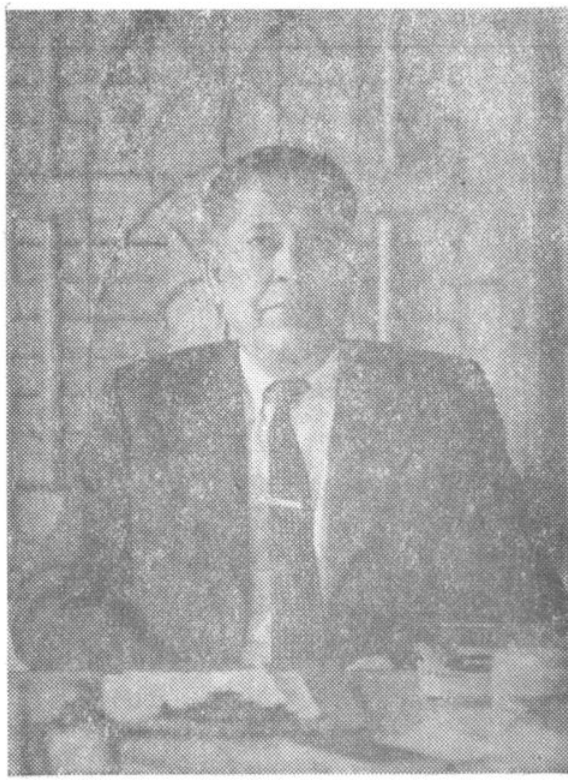

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

২০শে সেপ্টেম্বর '৮২ বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

১৯০২ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়া জেলায় ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কবিরাজ কুঞ্জলাল ভাদুড়ী। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তাঁর বিদ্যালয় জীবন অতিবাহিত হয়। সিটি কলেজ থেকে বি. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে এম. এস.-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তুলনামূলক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গ বিন্যাস সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জ্ঞানার্জন করেন। প্রজননক্ষম শারীরবিদ্যা—বিশেষতঃ গর্ভাবস্থা ও আনুষঙ্গিক অবস্থা নির্ণয়ে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

ডঃ ভাদুড়ী অল্প কিছুদিন ভারতে প্রাণীতাত্ত্বিক সমীক্ষায় কাজ করেছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি 'সার নীলরতন সরকার অধ্যাপক' ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মৌয়াট (Mouat) পদক এবং এশিয়াটিক সোসাইটি 'জয়গোবিন্দ লাহা পদক' প্রদান করে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রায় ৭০টির বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলায় জনপ্রিয় প্রবন্ধাদি রচনা করেন এবং 'প্রাণী-বিজ্ঞানের পরিভাষা' শীর্ষক পুস্তক রচনা করেন। এছাড়া তাঁর সঙ্কলন নামক একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৫১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাণীবিদ্যা ও কীট-পতঙ্গ বিদ্যা শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ডঃ ভাদুড়ী বহু বছর প্রাণীতাত্ত্বিক সমিতির কার্যবিবরণী সম্পাদনা করেছিলেন এবং পরে তিনি এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি পরে সায়েন্স ক্লাব ও ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সমিতির (Indian Science News Association) সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানা, পশ্চিমবঙ্গ বন্যপ্রাণী সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ-এর গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পৃথিবীতে তুষারযুগ

সুনীত রায়

এক সঙ্গে চারটে গরম সিঙ্গাড়া আর সেই সঙ্গে গরম চা খেয়েছ কি কখনো? যদি না খেয়ে থাক, তাহলে একটু কল্পনা করে দেখ দিকি নি, ঐ অবস্থায় মুখের চেহারাটা কেমন হয়। অর্থাৎ কিম্ভুত। ঠিক বলেছ। মুখটা যেমন কিম্ভুতের মতো, দেখতেও অনেকটা সেই রকমই। চেহারাটা অনেকটা পাটকাঠির মাথায় যদি আলু বসিয়ে জামা-কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়, যেরকম দেখতে হয় প্রায় অনেকটা কাছাকাছি। এখনো চিনতে পারছ না, লোকটা কে? আমাদের চলমান বিশ্বকোষ অরুণদা। পৃথিবীর হেন খবর নেই যা অরুণদার জানার বাইরে। এই তো ক'দিন আগের কথা আমাদের ইন্‌স্যাটে যখন কিসব যান্ত্রিক গোলযোগ হচ্ছিল, তখন আমাকে চুপিচুপি ডেকে বলেছিলেন আমি আগেই বলেছিলাম এরকমটা ঘটবে, দেখলি তো, মিলল কি না? আমিও অস্বীকার করতে পারলাম না। কারণ সত্যিই অরুণদা বলেছিল যে ইনস্যাট্ কেন, কোনো কিছুই ওপরে ওঠাতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পারবে না। ভুলের মধ্যে বলে ফেলেছিলাম, তোমার পরামর্শ নিচ্ছে না বলে তুমি একথা বলছ? কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দুটো কানচাপাটিতে আমার পুরো মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে গিয়েছিল। ভারতের বিজ্ঞান ভাবনা-চিন্তা নাকি পুরোটাই বুজরুকি বলে অরুণদা মনে করেন। কথার ওপর কথা বললেই যখন বকুনি খেতে হয়, তাই অরুণদার ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহবা দিলাম। অবশ্য সেদিনের কাগজেই ইনস্যাট্ নির্বিঘ্নে উপরে উঠেছিল বলে খবর বেরিয়েছিল। এ'কথাটা অবশ্য তখন আমি অরুণদাকে বলিনি। কারণ, বললে আমার কপালে তখন কি জুটতো, তা ভাবলেও ভয় লাগে। অরুণদার ওপর রাগ হলে কি হবে, আড্ডার আসরে অরুণদাকে না পেলে আবার দুঃখও হয়।

সেদিনটা ছিল ১লা বোশেখ। সন্ধেবেলায় কাবুলদের বাইরে ঘরে আমাদের জোর আড্ডা বসেছে। সেদিনের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল আগামী দিনে পৃথিবীর সম্ভাব্য পরিণতি। আলোচনা যখন প্রায় মারদাঙ্গার পর্যায়ে পৌঁছোবার উপক্রম হয়েছে, তখন মনে হল কে যেন একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কাবুলকে যেই বলতে গেছি, বাইরে থেকে কে · পুরো কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বাবলা এসে আমার জামার কলারটা চেপে ধরেই বলতে শুরু করে দিল, কতবার বলেছি পৃথিবীর বাইরে থেকে কোন জীব এখানে আসেনি, আসবেও না। আর যদি কারুর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আমরাই বাইরের গ্রহে আধিপত্য বিস্তার করব। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে যখন থামল, তখন বাবলাও হাঁপাচ্ছে, আর নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমিও হাঁপাচ্ছি। হঠাৎ রঞ্জিৎ এতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাফিয়ে উঠে বলে বসল, ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবী বরফের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। মানুষকে বাইরের গ্রহে আর যেতে হবে না। এই তো সেদিন 'মিকির' দৈনিক পত্রিকায় বড় বড় হেড লাইনে একটা খবর বেরিয়েছে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ক্রমশঃ বসে যাচ্ছে, আর সবচেয়ে বড় খবর হল হিমবাহ খুব দ্রুতগতিতে নেমে আসছে।

হিমবাহ দিয়ে পৃথিবীটা ঢাকা পড়ে যাবে আর উত্তর গোলার্ধ ক্রমশঃ বসতে বসতে দক্ষিণ গোলার্ধের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা চ্যাপ্টা আকার ধারণ করবে। তার ফলে সব জল ডাঙ্গার ওপর উঠে আসবে। মানুষ থাকবে নীচে তার ওপর জল আর তার ওপরে রঞ্জিতের গড়িয়ে আসা হিমবাহ ভাসতে থাকবে—বলেই হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে কে একজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি, সেই চিরাচরিত পাজামা পাঞ্জাবী পরা অরুণদা দাঁড়িয়ে আছেন! আমরা এবার একটু সঙ্কোচে জিগ্যেস করলাম—কতক্ষণ এসেছেন? চলুন ভেতরে চলুন।

ভেতরে তো যাবোই। তার আগে তোদের উর্বর মস্তিষ্কে একটু ট্রাক্টার চালিয়ে জমিটা ভালো করে চষে দেব।

কথাটা শুনেই আমাদের সবার ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া —আমরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম, তার মানে?

মানেটা খুবই সোজা। অনেকক্ষণ তোদের আলোচনাটা শুনছিলাম, আর যতই শুনছি ততই মনে হচ্ছে যে জীবনে কোনোদিন বইপত্তর পড়িস নি। মাথায় ঘিয়ের বদলে আছে নারকেল মার্কা ডালডা। কথাগুলো বেশ সুন্দরভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে বলতে, আমার প্যান্টের পকেটের রুমালটা কখন যে অরুণদার ঘাম মোছার সঙ্গী হয়ে গেছে, সেটা টেরই পাইনি। আর যখন টের পেলাম, ঠিক তখনই আমার পিঠে গদার মতো একটা থাপ্পড় মেরে বললেন বোস্ একটু, মাসীর সঙ্গে দেখা করে আসছি।

তখন বসে জমিয়ে গল্প করা যাবে—বলেই রুমালটায় সজোরে শিকনি ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

এতটা অপমান আমাদের কারোরই সহ্য হচ্ছিল না। এদিকে কিছু বলতেও পারছি না, যতই অরুণদা আমাদের পরিচিত হোন না কেন, তবু কোনো কটু মন্তব্য তার সম্বন্ধে অন্তত কাবুলের সামনে তো আর করতে পারি না। অরুণদা, কাবুলের সম্পর্কে মামাতো দাদা হয় বলে শুনেছি। কিন্তু, আমি কিছু বলার আগেই বাবলা দড়াম করে বলে বসল—দেখ কাবুল, ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করে ভিত পাকা করছি বলে এ'রকম অপমান সহ্য হয় না। আমিও বাবলার স্বরে স্বর মিলিয়ে বললাম, আমার রুমালটা এভাবে নাক ঝেড়ে নষ্ট করাটা অরুণদার ঠিক উচিত হয় নি।

আমাদের কথায় কাবুল বেশ লজ্জা পায়। তোরা ভাই কিছু মনে করিস না। জানিস তো অরুণদা কেমন যেন একটু অন্য ধরনের। যে কোনো বিষয়ে অরুণদার যে অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, তা নিশ্চয়ই তোরা অস্বীকার করবি না। কিন্তু কি করব বল? অরুণদা কাউকে ধরলে আর তাকে সহজে ছাড়েন না।

না ছাড়াছাড়ির কোনো ব্যাপারই নেই। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। যদি এর ঠিক উল্টোটা হত, তাহলে নিউটন তৃতীয় সূত্র লিখতেন না আর পৃথিবীতেও আবার তুষার যুগ আসতো না। পৃথিবীতে এক সময় তুষার যুগ এসেছিল। আজ থেকে প্রায় দুলক্ষ বছর আগে পাহাড়ের হিমবাহগুলো আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমভূমিতে নেমে এসে নতুন নতুন অঞ্চল ক্রমাগত বরফে ঢেকে ফেলছিল আর সেই সঙ্গে প্রাণীরাও বাঁচার তাগিদে—বলেই অরুণদা চুপ করে গেলেন। আমরা যখন অরুণদার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি অরুণদা তখন একমনে দেওয়ালের গায়ে টিকটিকি আর উচ্চিংড়ের লড়াই দেখতে মশগুল। কিছুক্ষণের মধ্যে উচ্চিংড়েটা ছটফট করতে করতে টিকটিকিটার মুখ থেকে পালিয়ে গেল। আর ঠিক তখনি অরুণদা শুরু করলেন, উচ্চিংড়েটা যেমন পালিয়ে গেল, তেমন ভাবেই সেদিন প্রাণীরাও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়ে গিয়েছিল বাঁচার তাগিদে। তারপর কি হয়েছিল বলতে গেলে আমরা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাব, তার থেকে বরং তোমরা বল পৃথিবীতে মোট তাপের কতটা আসে সূর্য থেকে?

আমি একবার কাবুলের মুখের দিকে, কাবুল একবার বাবলার মুখের দিকে তাকায়। কারুর কোনো কথা নেই। ইতিমধ্যে কাবুলের মা আমাদের সবার সামনে মিষ্টি আর পরোটা দিয়ে সুন্দর ভাবে প্লেটগুলো সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না। কিন্তু, এর ফল যে এতটা বেদনাদায়ক হবে ভাবেতেও পারিনি। আমাদের চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অরুণদা অম্লান বদনে নিজের প্লেটটা শেষ করে আমাদের খাবারগুলো নিজের প্লেটে ঢেলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলেন। শেষ পরোটার টুকরোটা মুখে দিয়ে অরুণদা বললেন, আমি জানতাম তোরা পারবি না। পৃথিবীর মোট তাপের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে ভূগর্ভ থেকে আর শতকরা ২৫ ভাগ আসে সূর্য থেকে। সূর্যের এই তাপ যদি কয়েক শতাংশ কমে যায়, তাহলে এই পৃথিবীতেই এক বিশাল তুষার যুগের আবির্ভাব হবে।

এখন চাঁদের আবহাওয়া কি বসবাসের উপযোগী? মোটেই না—মানুষ কোন অবস্থাতেই এখন ওখানে থাকতে পারবে না। আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবির্ভাব হয়, কিন্তু শুনলে অবাক লাগে যে মাত্র ১০ লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর অনেক জায়গাই বর্তমানে মেরু প্রদেশের তুষার দিয়ে ঢাকা ছিল।

আগে নাকি ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা আরো কয়েকটা দেশ নাকি একসঙ্গে ছিল? কাবুল বেশ আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে অরুণদাকে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। ঐ দেশগুলোর সঙ্গে মাডাগাস্কার, অ্যান্টার্কটিকাও ছিল। এই সংযুক্ত বিশাল মহাদেশটার নাম হল গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন সে সময়ে অর্থাৎ ২৫ কোটি বছর আগে এক বিশাল তুষারযুগ ঐ মহাদেশে দেখা গিয়েছিল। ভারতবর্ষ ছাড়া আফগানিস্তানের হীরাট ও ইউরাল পর্বতে তুষার যুগের প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। এই তুষার যুগের পর পৃথিবীর আবহাওয়ার উত্তাপ আবার আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। তার ফলে বরফ গলতে শুরু করল। বরফ গলে যাওয়ার পর বহু বিচিত্র ধরনের গাছপালা পৃথিবীতে জন্মাল। সে-সব গাছপালা আবার বিভিন্নভাবে মাটির তলায় তলিয়ে গেল। এদেরই পরিবর্তিত রূপ—আজকের কয়লা। এরপর ২২ কোটি বছর ধরে ভারতে কোনো তুষার যুগের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১০ লক্ষ বছর আগে বেশ একটা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের উদ্ভব। আর ঠিক তখনি ভারতবর্ষে আবার তুষার যুগ নেমে এল। সে সময়ে গিরিরাজ হিমালয়ের বয়সও অল্প, আর আয়তনেও খুব একটা বিশাল নয়। তাই এই হিমালয়ও তুষারের তলায় ঢাকা পড়ে গেল।

আচ্ছা অরুণদা, তুষারযুগ এসেছিল শুধু এটাই আপনি বললেন। কিন্তু, কি করে এই পরিবর্তন পৃথিবীর বুকে হয়, সে বিষয়ে তো কিছু বললেন না। আমি বেশ বিজ্ঞের মতো উত্তর শোনার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

এই তুষারযুগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মতামত বিভিন্ন বিজ্ঞানী দিয়েছেন। প্রাচীনকালে জলভাগটা স্থলভাগের থেকে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে। কারণ, ভূগর্ভস্থ তাপ স্থলভাগ থেকেই তাড়াতাড়ি বিকিরিত হয়। এজন্যে উত্তপ্ত জল থেকে বাষ্প সৃষ্টি হত। এই বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করে সমস্ত বায়ুমণ্ডলটাকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে দিত যে সূর্য-তাপ পৃথিবীতে আসতে পারত না। এর ফলে স্থলভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে বরফ সৃষ্টিতে সাহায্য করত। আবার জলভাগ ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠত, যখন ঠাণ্ডা হাওয়া মেঘ সরে গিয়ে সৌরতাপ আসতে শুরু করত। এই বিশ্লেষণ আমরা বৈজ্ঞানিক ম্যাসনের কাছ থেকে পাই। অবশ্য এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক আছে।

অতীতে মেরুপ্রদেশের হিম—বিষুব অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। সেলেস্টিয়াল মেকানিক্সের হিসেব অনুযায়ী ৫০,০০০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর গোলার্ধে আবার তুষার যুগ নেমে আসবে। আর ২০,০০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবী উষ্ণতর থেকে উষ্ণতম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। অবশ্য, অতদিন মানব সভ্যতা টি'কে থাকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি বেঁচে থাকে বলে ধরে নিই—তাহলে এই মহাব্যাপী তুষার যুগের শেষে মানব সভ্যতা নতুনভাবে তৈরী হবে কিম্বা আজকের মানুষ জীবাশ্ম হিসেবে তখনকার মিউজিয়ামে সুসজ্জিত থাকবে।

এই আগত তুষার যুগকে নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়ার সব সেরা সেরা বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তায় মগ্ন। এ জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটা প্ল্যানিং দল তৈরী করার কথা হচ্ছে। ভারত থেকে আমাকে যাওয়ার জন্যে এই বিশ্বসংস্থা সপ্তাহে প্রায় দুটো করে চিঠি পাঠাচ্ছে। কি করব, তাই ভাবছি। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণদা বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা তাঁর কথাটা বিশ্বাস করি নি। তাই পাঞ্জাবীর পকেট থেকে খান পাঁচেক চিঠি বের করে চোখের সামনে এক পলক ঘুরিয়েই পকেটস্থ করে বাড়ীর বাইরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন—আমাদের চলমান বিশ্বকোষ দি গ্রেট অরুণদা! ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমি একবার চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, ভারত সরকারের অশোক স্তম্ভের খাম বুঝি আমেরিকা, রাশিয়া আজকাল ব্যবহার করছে অরুণদা।

৪০০, ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা, কলি-৭০০০৭৪

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড : একাদশ শ্রেণী

প্রথম খণ্ড
একাদশ শ্রেণী
দ্বিতীয় খণ্ড
দ্বাদশ শ্রেণী
প্রকাশিত হয়েছে

⊛ প্রচুর গাণিতিক উদাহরণযোগে, নানা রাসায়নিক গণনা সহজবোধ্যভাবে করে দেওয়া আছে। ⊛ অবজেক্টিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ধরনেরই প্রশ্নের সংকলন (এবং গ্রন্থে তার উত্তর) করা হয়েছে। ⊛ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের সাধারণ ত্রুটি ও তার সংশোধন এবং কিছু আদর্শ প্রশ্নোত্তর দিয়ে একটি বিশেষ উপযোগী অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ⊛ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, কিছু উত্তর পৃথকভাবে করা হয়েছে।
⊛ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি—প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ॥ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

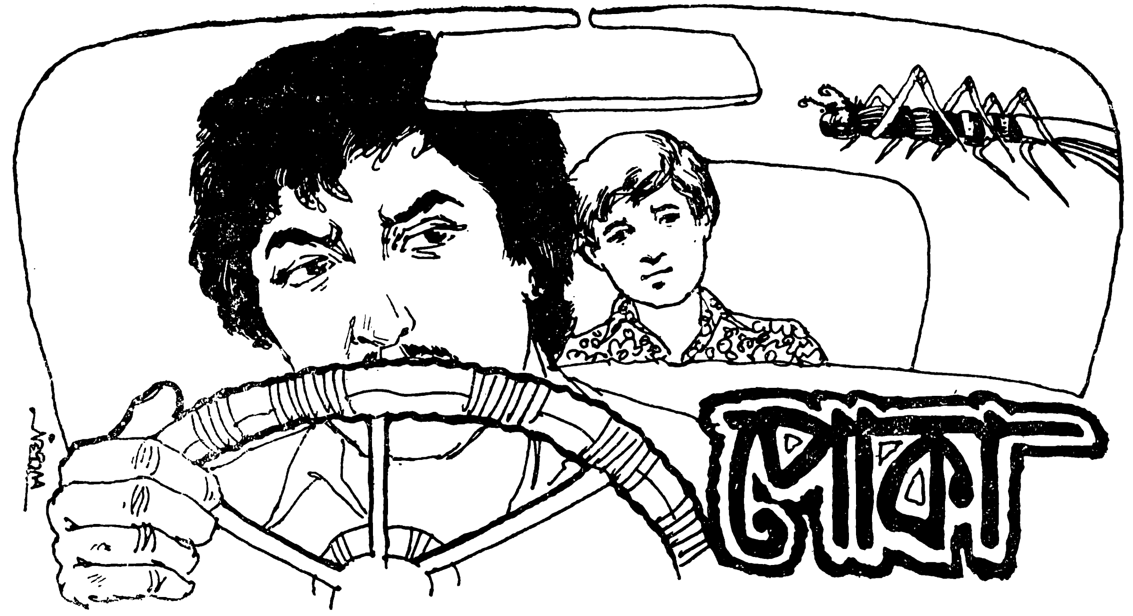

পোকা

শ্রীধর সেনাপতি

আগেরদিন অতনু টালিগঞ্জ গিয়েছিল। মামা বাড়ি। রাত্রে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। শীতের সকাল। উত্তুরে হাওয়া বইছে হাড় কাঁপিয়ে। মামার গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিল অতনু। ওদের বাড়ি উত্তর কলকাতায়। মামার ড্রাইভার সুদর্শনদা গাড়ি চালাচ্ছে। ড্রাইভারের দিকে ছাড়া গাড়ির সবকটি জানলায় কাঁচ আঁটা।

গাড়ির ভেতরে উইণ্ডশীল্ডের মাথার কাছে পাট্‌কিলে রঙের একটা পোকা বসেছিল চুপচাপ। দেখতে প্রায় গঙ্গাফড়িংয়ের মতো, পোকাটা হঠাৎ গাড়ির ভেতরে ওড়াউড়ি শুরু করে দিল। একটা জ্‌-জ্‌-জ্‌-জ্‌-জ্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগলো ক্ষীণভাবে।

মনে হলো পোকাটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। গাড়ির খোলা জানলাটির দিকে উড়ে যেতে যেন সেটার সাহসই নেই। দিশাহারার মতো বার বার ভুল করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উইণ্ডশীল্ডের গায়ে। মাঝে মাঝে পড়েও যাচ্ছে গাড়ির ড্যাসবোর্ডের ওপর।

রাস্তায় এক জায়গায় লাল চোখ দেখে গাড়ি থামাতে হলো। অতনু তখন ওর পাশের জানলার কাঁচ একবার একটু নামিয়ে দিল। এবার হয়তো পোকাটা গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। পর মুহূর্তে অতনুর মনে হলো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা অচেনা অজানা অনভ্যস্ত জায়গার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে থাকতে পোকাটার হয়তো বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে কিছুটা।

নাঃ! সায়ান্স-ফিক্‌শনে আর মনবসানো গেল না। অতনু হাতের খোলা বইখানা মুড়ে ফেলে বললো, 'সুদর্শনদা,' পোকাটাকে অমনি তাড়ানো যাবে না বোধ হয়। হাত দিয়ে আল্‌তোভাবে ধরে গাড়ির বাইরে ছেড়ে দাও।'

সুদর্শন বললো, 'থাক্‌ না যেমন আছে। পরে পালিয়ে যাবে'খন্‌, যখন ওর ইচ্ছে হবে—'

অতনু হেসে বললো, 'ইচ্ছের কথা যখন বললে, তাহলে বলি, আমার মনে হয় পোকাটা পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছটফট্‌ করছে!'

'পোকাটার মনের কথা তুমি তাহলে বুঝতে পারছো?'

রাস্তায় লালের পর সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। থেমেপড়া গাড়ির সারি সাপের মতো সচল হলো। পোকাটা এবার অলস পায়ে উইণ্ডশীল্ডের মাথার কাছে ঘোরা ফেরা করতে লাগলো।

অতনু বসে বসে ভাবতে লাগলো পোকাটার বাসার কথা।

'সুদর্শনদা,' পোকাটা গাড়ির ভেতরেই এখন থাকুক। অতনু বললো, 'তুমি ওকে ফের টালিগঞ্জে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিও। কেমন?'

পোকাটার চিন্তা সারাদিন ছায়ার মতো অতনুকে অনুসরণ করে বেড়ালো। রাত্রে যখন বিছানায় শুতে

গেল, তখনও পোকার কথাটা ও ভুলতে পারেনি…ভিন্ গ্রহের প্রাণীদের নিয়ে লেখা গল্পটাও এখনও পর্যন্ত পড়া শেষ হয়নি। তাই বিছানায় শোবার সময়েও বইটা হাতছাড়া করেনি অতনু…

অতনুরা পিক্‌নিক করতে এসেছিল। দলে রয়েছে জন কুড়ি ছেলে। সকলেই প্রায় সমবয়সী। পাহাড়ের এক জায়গায় রান্নার তোড়জোড় চলছে। তাস, ক্যারম নিয়ে বসে গেছে কেউ কেউ। একদল টেপ্ রেকর্ডার ঘিরে গান শুনছে। কিন্তু অতনু ওর চারপাশের দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারেনি। আহা! কী চমৎকার জায়গা! একাই এপাশে ওপাশে একটু ঘুরে দেখার জন্যে অতনু দল থেকে দূরে সরে গেল। দলের কাউকে জানিয়ে গেল না।

অতনু ঘুরতে ঘুরতে বনের আরও গভীরে পৌঁছলো এক সময়ে। সবুজের ভেতর দিয়ে ছোট বড় গাছ আর লতাগুল্মের অবরোধ ভেঙে নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে বেড়াতে খুবই ভাল লাগছিল অতনুর। খানিকবাদে এক জায়গায় পৌঁছে থম্‌কে দাঁড়ালো অতনু। ওর সামনে একটা সমতল ফাঁকা জায়গা। তারই মাঝখানে রয়েছে লম্বা গম্বুজের মতো কী একটা জিনিস। ধাতুর তৈরীই হবে। কারণ সূর্যের আলো লেগে জিনিসটা চক্‌চক্ করছে খুব। তিনটে বাঁকা পায়ের ওপরে খাড়া রয়েছে জিনিসটা।

খুব কাছে এগিয়ে গেল অতনু। জিনিসটার গায়ে একটা ছোট দরজা। দরজাটা খোলা। বাইরে থেকে ভেতরের দিকে একবার উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো অতনু। দরজাটা একটু উঁচুতে রয়েছে। তাই ভেতর দিকটা সম্পূর্ণভাবে নজরে এলো না। ধাতুর তৈরী ছোট্ট একটা সিঁড়ি মাটি থেকে ওই দরজা পর্যন্ত লাগানো রয়েছে।

অতনু প্রথমে একটু ইতঃস্তত করলো। তারপর সিঁড়িটাকে ধরলো দুহাত দিয়ে চেপে। ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। অতনুর প্রতিবিম্ব ফুটে উঠতে লাগলো বিভিন্ন জায়গায়! অতনু দেখলো, ভেতর থেকে আবার একটা ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। ওই সিঁড়ি দিয়ে ও ফের আরও ওপর দিকে উঠতে লাগলো। কিন্তু সিঁড়িটা এবার যেন চট্ করে শেষ হচ্ছে না। ঘোরানো, গোলক ধাঁধার মতো। অতনু সিঁড়ির ওপরে ঘুরছে তো ঘুরছেই!

বাইরে থেকে দেখে খুব একটা বিশাল জিনিস মনে হয়নি। এবার একটু ভয় পেল। শেষে পাশে একটা ছোট দরজা নজরে পড়লো ওর। দরজাটা বন্ধ।

ওখানে কান পাতলো অতনু, কোন রকম সাড়াশব্দই নেই। সামান্য একটু ঠেলতেই খুলে গেল দরজাটা নিঃশব্দে! এখানেও ভেতরে কেউ নেই! তবে কেউ-একজন যে ছিল, তার প্রমাণ এই প্রথম নজরে এলো অতনুর। এখানে কিছু সরঞ্জাম রয়েছে। ঠিক চেয়ার বা কাউচ নয়, ওই দুটো জিনিসকে মিলিয়ে ক্রুসচিহ্নের মতো কিছু আসন, যাতে বেশ আরাম করে বসা যায়। আসনগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো।

একদিকে দেওয়ালের পাশে একটি ছোট টেবিল বা বেঞ্চ। তারপরে কতকগুলো ছোট বড় বাক্সের মতো পাত্র রয়েছে। সবকটি ধাতুর তৈরী। কী ধাতু কে জানে, তবে ঝক্‌মক করছে নিখাদ রূপোর মতোই।

কিছুক্ষণ বসে রইলে আরামে চোখের পাতা বুজে আসতে চায়। তবে ঘুমোলে তো চলবে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওদিকে বন্ধুরা হয়তো ওকে খোঁজাখুজি করছে!

ঘুম তাড়ানোর উদ্দেশ্যে অতনু ওর পকেট থেকে একটা ছুরি বের করলো। তারপরে হাতের নখ কাটতে লাগলো ছুরি দিয়ে। তা সত্ত্বেও অতনু ওর দু'চোখের পাতা খুলে রাখতে পারলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওখানে বসে ঘুমিয়ে পড়লো।

তবে ঘুমটা আচমকাই ভেঙে গেল এক সময়ে। অতনু চমকে উঠলো। একী! ওকে ঘিরে এখন যেন একটা সূক্ষ্ম কাঁপন জেগে উঠেছে চারপাশে। ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ও দরজার দিকে দৌড়ে গেল। দরজা খোলা নেই! ও কাঁধ দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে খুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দরজা এখন অনড়! অতঃপর অতনুর মনে হলো দরজাটা হয়তো বাইরের দিকে না, ভেতর দিকে খোলা যায়। অতএব টানতে হবে। কিন্তু চেপে ধরবার মতো একটিও 'নব্' নেই দরজার গায়ে।

অতনুকে ঘিরে সূক্ষ্ম কাঁপনটা থেকেই যাচ্ছে। কাছে হোক, বা দূরে হোক, কোথাও কোন একটা ইঞ্জিন চলছে বলেই মনে হতে লাগলো অতনুর! অমনি প্রচণ্ড এক আতঙ্কে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো! তে-ঠেঙ্গে এক গম্বুজের মতো দেখতে কী জিনিসের মধ্যে ঢুকেছিল অতনু? এবার ও যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ও এখন একটা প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে রয়েছে!

অতনু হতাশ হয়ে একটা চেয়ার-কাউচে ধপ্ করে বসে পড়লো। আর তারপরেই ও লক্ষ্য করলো, দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে! কে আসে?

অতনু ছুরিটা হাতে নিয়ে ধরা ধরা গলায় বললো, 'ঠিক আছে! এগিয়ে এসো! আমি তৈরী!'

একটু একটু করে সম্পূর্ণভাবে খুলে গেল দরজা। কিন্তু ভেতরে কেউ এলো না! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অতনু সতর্ক পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অতনু করিডরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। করিডরের শেষ দিকে আর একটি দরজা দেখতে পেল অতনু। খোলা দেখে ইতঃস্তত না করে ফস্ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ভেতরে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো থমকে!

একটি চেয়ার-কাউচের ওপরে বেশ কায়দা করে শুয়ে ছিল প্রাণীটা! চেয়ার-কাউচের পাশে মেঝেতে বসানো রয়েছে একটা ঝকমকে রূপোলী বাক্স। বাক্স থেকে প্রায় সরু তারের মতো নল এসে ঢুকেছে প্রাণীটার মুখের ভেতরে।

ওইভাবে কি প্রাণীটার আহার কার্য চলছে? ভাবতে ভাবতে অতনু প্রাণীটার চোখের সঙ্গে নিজের চোখ মেলালো। তাতে প্রাণীটার আহার গ্রহণে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো না। প্রাণীটাকে দেখতে প্রায় মানুষের মতো। তবে খর্বাকার। মাথা শরীর…হাতির কানের মতো দেখতে প্রাণীটার কান দুটো। গোলাকার চোখ দুটোতে টুনি জলার মতো নীল আলো। দেহের চারটি অঙ্গ কীভাবে ব্যবহার করে, প্রথম নজরে বোঝা গেল না। ওগুলো দেখতে মানুষের হাত এবং পায়ের মিলিত এক মধ্যবর্তী রূপ। প্রথমে প্রাণীটাই কথা বললো অতনুকে লক্ষ্য করে। বললো, 'দুঃখিত! আমি জানি তোমার গ্রহ পৃথিবী! কিন্তু আমি এখন নিরুপায়। এখনি আমি আর সেখানে ফিরে যেতে পারি না।'

প্রাণীটি ফের বললো, 'আমার এই মহাকাশযানের যা' রসদ এখনও রয়েছে, তাতে সৌরজগতের বহু-বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে আমাকে। আর, তোমাকেও তাই আমার সঙ্গে থাকতে হবে। তোমাদের এদিকে ফিরে আসতে আমার সময় লাগবে—তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু'বছর। তখন তুমি আবার তোমার বাড়ি ঘর আত্মীয় প্রিয়জনদের কাছে পাবে। তবে যতদিন না সেটা সম্ভব হচ্ছে তোমার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে।'

প্রাণীটা ফের কথা বলতে শুরু করলো, 'তুমি খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছ বুঝতে পারছি। আমার কোন অপরাধ নিও না। তোমাদের পৃথিবীর ওই জঙ্গল পাহাড় ঘেরা জায়গাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, ধারে কাছে কোন মানুষের বসতি নেই দেখে। আমার এই মহাকাশযানের অ্যাট্‌মসফিয়ার-ট্যাঙ্কগুলোতে নতুন করে শক্তি সঞ্চালনের দরকার হয়েছিল। তোমাদের ওই গ্রহে আমি আগেও কয়েকবার গিয়েছিলাম। পৃথিবীর কোন মানুষই তখন আমাকে দেখতে পায়নি। অন্ততঃ আমার নিজের ধারণা তা-ই। এবার একমাত্র তুমিই আমাকে এভাবে দেখে ফেললে।

একটু দম নেবার জন্যে প্রাণীটা থামলো। তারপর আবার শুরু করলো, 'তুমি পৃথিবীর মানুষ। তোমরা তো কথা বলতে পারো। তোমাদের নিজস্ব ভাষা আছে। তবে বোবার মতো চুপ করে আছো কেন? তোমার ভাষা আমার কৌতূহল জাগাবে। সম্ভবতঃ তাতে বুদ্ধির ছাপও আমার কাছে ধরা পড়বে। অতএব কথা বলো। আমি সেটা স্টাডি করার জন্যে রেকর্ড করে নেবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো।'

করিডর শেষ। ওরা ঢুকলো একটা ঘরে। ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটি বললো, এটা কন্‌ট্রোলরুম!' ঘরের মধ্যে স্ট্যাণ্ডের ওপরে একটা রূপোলী চৌকো বাক্সের মতো যন্ত্র রয়েছে, ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো প্রাণীটি। যন্ত্রটার মধ্যে কী যেন দেখলো মনোযোগ দিয়ে।

'সব ঠিক চলছে।' প্রাণীটি খুশী হয়ে বললো,' 'আমরা এখন কোথায় রয়েছি, তুমি কি দেখতে চাও?' বলেই, যন্ত্রটার এখানে ওখানে প্রাণীটি কয়েকবার দ্রুত হাত রাখলো। অমনি দেওয়ালের একটা অংশ পরিণত হয়ে গেল স্ক্রীনে। স্ক্রীনের বুকে মহাশূন্যের একটা অংশ ছবি হয়ে ভেসে উঠলো। কালো আকাশের বুকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা ঝিক্‌মিক করছে! চাঁদ! আরো—আরো দূরে একটা সবুজ গোলক। ওটা পৃথিবী!

'কি সুন্দর দৃশ্য! তাই না?' ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটা বললো, 'অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে তোমাদের পৃথিবীটাই সেরা বলে মনে হয়। শীগ্‌গির এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা পৃথিবীর বুকে অভিযান চালাবো। তার আগে তোমাদের মুখের ভাষা জেনে শিখে নেবার পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে ভাষাটা বাধা হবে না।

তোমার ভাষাও তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে। তুমি যাতে এখানে আরামে থাকতে পারো, সেটাই আমার এখন দেখা দরকার।

বলে, দেওয়াল স্ক্রীন থেকে ছবি অদৃশ্য করে দিল প্রাণীটি। তারপর একটা রূপোলী বাক্স এনে রাখলো কাউচের কাছে।

অতনু কাউচে বসবার ইঙ্গিত পেল প্রাণীটির দিক থেকে। ইঙ্গিতটা বুঝে ও বসলো। প্রাণীটি ওর হাতে রূপোলী বাক্স থেকে বেরিয়ে আসা একটা তারের মতো সরু নল ধরিয়ে দিল।

নলের ভেতর দিয়ে কুসুম কুসুম গরম অর্ধতরল পদার্থ বেরিয়ে অতনুর মুখে পড়ছে। তারই প্রভাবে দেখা যায়

বিদ্যুতের শক্ খাওয়ার মতো মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিয়ে উঠছে ওর সমস্ত শরীরটা।

ভিন্‌গ্রহী প্রাণী বললো, 'বস্তুটার কোনরকম স্বাদ নেই। তবে ওটার প্রতিক্রিয়া তোমার দেহটাকে চাঙ্গা করে রাখবে! অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল অতনু একটা পরিতৃপ্তভাব নিয়ে তলিয়ে গেল ঘুমের মধ্যে।......

ঘুম যখন ভাঙলো—অতনু সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা খুলতে পারলো না। একটা অফুরন্ত আরামের মধ্যে ওর শরীরটা যেন এখনও ডুবে রয়েছে। অতনু জানে ও এখন কোথায় রয়েছে। তবু ওর মনে আর কোন ভয় বা আতঙ্ক ছায়া ফেলতে পারছে না। বিচিত্রদর্শন প্রাণীটিকে ওর এখন বেশ বুদ্ধিমান আর বন্ধুর মতো মনে হতে লাগলো।

অতনু ভাবতে লাগলো, এখনি পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া একটা সমস্যা বটে। তবে অপেক্ষা করাও চলে।

ভাবতেই আচমকা খুলে গেল দু'চোখের পাতা। অন্য পাশে টেবিলের দিকে নজর গেল। একটা মানুষের দেহ শোয়ানো রয়েছে। কিন্তু কার দেহ ওটা? নিজেকে পনেরো ষোল বছর ধরে দেখে আসছে অতনু। তাই নিজের দেহটাকে ওর চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। আশ্চর্য! দেহটা যে অতনুরই। শুধু ধড়ের কাছ থেকে মুণ্ডুটা উধাও! অতনু আরও লক্ষ্য করলো, গোটা দেহের ভিতর দিয়ে জলের মতো আলোর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শরীরের ভিতরের খুঁটিনাটি অংশ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে এক্সরে ছবির মতো।

অতনু কোনরকম জ্বালাযন্ত্রণা অনুভব করছে না। ওর মাথাটাকে বোধহয় বিচ্ছিন্ন করা ঘাড়ের ওপরেই বসিয়ে রাখা হয়েছে, চোখদুটো এপাশে ওপাশে ঘোরাতে পারছে। ওপর দিকে ও তাকিয়ে দেখলো, একটা রূপোলী চৌকো বাক্স থেকে ওর মাথা লক্ষ্য করে ঝরণার মতো অবিরল ঝরে পড়ছে একটা ভায়োলেট রশ্মি।

ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি এলো।

'তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে দেখছি।' ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি বললো, 'ভেবেছিলাম, আমি তোমাকে রেকর্ড করে নেবার পরও তোমার ঘুম ভাঙতে দেরী হবে। জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই। যাই হোক আমি তোমাকে আবার এক করে দেব নিশ্চয়ই। তুমি এখন লক্ষ্য করছো, তোমার মুণ্ডুটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, দেহটাও আর আগের মতন নেই! তাইতো। কিন্তু এ সবই তোমার চোখের বা মনের ভুল। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তুমি আমাদের কাছে অন্যগ্রহের প্রাণী। পৃথিবী থেকে আসছো। এমনি যে কোন গ্রহের যে কোন প্রাণীকে পেলেই আমরা এভাবে আগে তার শরীরের সবকিছু অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিই। তোমার জৈবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমি রেকর্ড করে নিয়েছি। আর, তোমার মাথার ওপরে যে ভায়োলেট্ রশ্মির বিচ্ছুরণ দেখতে পাচ্ছো. ওর সাহায্যে তোমার মনের রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে।'

ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি এবার সরে গেল দেওয়ালের কাছে। ওখানে রয়েছে অসংখ্য সুইচ্। হিসেব করে ও সুইচের পর সুইচ্ টিপতে লাগলো, ভায়োলেট্ আলোটা গেল নিভে। অতনু বুঝতে পারছে. তার ঘাড় থেকে মাথাটা অবিচ্ছিন্নই রয়েছে। তবু গলায় একবার হাত বুলিয়ে সে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইলো। দেখে হাসি পেল ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটির।

ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি যখন একটা যন্ত্রের দিকে একমনে কিসব দেখাচ্ছিল, অতনু হঠাৎ ক্ষিপ্তভাবে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসলো তাকে।

ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'শান্ত হও। আমি তো কোন ক্ষতি করিনি তোমার। তবে কেন তুমি একাজ করতে যাচ্ছো! তুমি নিজের ইচ্ছাতেই আমার এই মহাকাশযানে উঠেছিলে। আমার কোন দায় নেই। আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি। আমার কাছে তুমি তো একটা তুচ্ছ পোকার মতো। তোমার প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণও নেই। আরও কত কোটি কোটি মানুষই তো তোমার মতন।

কথা শেষ হবার আগেই ফের আক্রমণ করতে উদ্যত হলো অতনু। তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটি দেওয়ালের গায়ে একটা সুইচে হাত রাখলো। অতনু অমনি শূন্য থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো একপাশে। সেখানে জ্বলে উঠলো একটা তীব্র আলোকরশ্মি। অতনুকে একটা প্রচণ্ড উষ্ণতা কম্বলের মতো জড়িয়ে ধরলো।

নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভিন্‌গ্রহী প্রাণীটি বললো, এতে আমার কোন অপরাধ নেই! শুধু তোমার নিজের দোষে তোমার শরীরের ছাইভস্ম মহাশূন্যে ভেসে গেল।......

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নটাও ভেঙে গেল অতনুর।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে এতই ঘেমে উঠেছিল যে বিছানাটা ভিজে শপ্ শপ্ করছে এখন। তবে রীতিমত একটা উত্তেজনার রেশ রয়ে গেছে ওর শরীরে। সায়ান্স ফিক্‌শন্ বইটা মাথার বালিশের কাছে রয়েছে পড়ে। আর, কি আশ্চর্য ঠিক এই সময়েই সেই পোকাটার কথা অতনুর বেশী করে মনে পড়লো। গতকাল গাড়িতে বন্দী পোকাটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি করেছিল সুদর্শনদা!

১৬৫/৬, ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া-৬

এইসব বইগুলো আমি কিনতে পেরেছি আমার এই ছোট্ট বইটির জন্যে...

ইউকোব্যাঙ্কের পাস বই

আমার এই পাস বইটি বলে দেবে ইউকোব্যাঙ্কে আমার কত টাকা। এখানে আমার জমা টাকা একটু একটু করে বেড়ে যায়। বাড়তি এই টাকাই হলো সুদ— ইউকোব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যা পাওয়া যায়।

সুতরাং হাত খরচের টাকা বাড়াতে হলে ইউকোব্যাঙ্কে একটা পাস বই করে নাও। আজই!

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/DAS-113/82 BEN

তাপ সংদীপ্তি

ডঃ অলক চক্রবর্তী

তাপ প্রয়োগের ফলে আলোক উৎপত্তির ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে লাভা এবং আরও অনেক জিনিসের বয়স নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা "তাপ-সংদীপ্তি" বলে থাকেন।

তাপ-সংদীপ্তির ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে গেলে প্রথমে জানা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর মাটিতে সমস্ত জায়গায় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম মৌল দুটি এবং পটাসিয়াম মৌলটির কয়েকটি আইসোটোপ বা একস্থানিক আছে। এই ধরনের সমস্ত পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার ফলে আলফা কণা, বিটা কণা, এবং গামা রশ্মি বিকিরণ করে।

এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণগুলি যখন কোন পদার্থকে আঘাত করে, তখন ঐ পদার্থের কিছু কিছু ইলেকট্রন পরমাণুগুলির সুস্থিত কক্ষপথ ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরমাণুগুলির সুস্থিত কক্ষপথ ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরমাণুগুলির মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে আটকা পড়ে যায়। এর ফলে পদার্থটিতে তাপ-সংদীপ্তি শক্তি সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ পদার্থ দ্বারা শোষিত বিকিরণের মাত্রার সমানুপাতিক হয়।

এইবার পদার্থটিকে 400°C থেকে 500°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে সমস্ত অবরুদ্ধ ইলেকট্রনগুলি স্থগিত কক্ষপথগুলিতে ফিরে যাবে এবং এর ফলে সঞ্চিত শক্তি তাপ-সংদীপ্তির আকারে পদার্থটি থেকে বেরিয়ে আসবে। এভাবে সৃষ্ট তাপ-সংদীপ্তির পরিমাপ করে, বিভিন্ন বস্তুর বয়স অথবা জন্মকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

কোন বস্তু যত বেশী পুরোনো হবে, তার তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় তত বেশী ঘটবে। যত বেশী আলফা বিটা এবং গামা রশ্মির বিকিরণ হবে, তত বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয়ে পরমাণুগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে এজন্য আমরা আশা করতে পারি যে, উত্তপ্ত করার ফলে পুরাতন মাটির জিনিস থেকে নির্গত তাপ-সংদীপ্তি কালে তৈরী বস্তু থেকে নির্গত তাপ-সংদীপ্তির তুলনায় অনেক বেশী তীব্র হবে। বাস্তবেও এই জিনিসটাই ঘটতে দেখা যায়। প্রাচীন লাভা প্রবাহে অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহ থেকে পাওয়া সমস্ত মাটির পাত্রে তাপ সংদীপ্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে, সম্প্রতি আগুনে পোড়ানো মাটির জিনিস অথবা সদ্য ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া লাভাকে গরম করলে তাপ সংদীপ্তির সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সমস্ত পদার্থেও অবক্ষয় ঘটার ফলে ইলেকট্রনগুলি পরমাণুসমূহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অবরুদ্ধ হবে। তখন উত্তপ্ত করলে এগুলিতে তাপ-সংদীপ্তির সৃষ্টি হবে।

তাপ-সংদীপ্তির সাহায্যে কোন পদার্থের বয়স নির্ণয় করতে গেলে প্রথমেই পদার্থটির একটি অংশ থেকে চূর্ণ প্রস্তুত করে চূর্ণীকৃত অংশকে প্রমাণ ক্ষেত্রফল ও ঘনত্বে রাখতে হবে। একটি উত্তপ্ত পাতের উপর সাবধানে চূর্ণ ছড়িয়ে পাতটিকে একটি আলোক নিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর রাখতে হবে।

প্রকোষ্ঠের মধ্যে রাখা নমুনা থেকে উৎপন্ন আলো একটি আলোকবিদ্যুত পরিবর্ধক নলের সাহায্যে মাপা হয়। নলের সাহায্যে মাপা আলোর পরিমাণ এবং নমুনার পৃষ্ঠতলের উষ্ণতা তথ্যের আকারে লিপিবদ্ধ করে তার থেকে যে লেখচিত্র প্রস্তুত হয়, তাতে বিকীর্ণ আলোর পরিমাণের সঙ্গে নমুনার উষ্ণতার সম্পর্কটি পাওয়া যায়। এটি তাপ-সংদীপ্তি লেখচিত্র নামে পরিচিত। এর পর আলফা ও বিটা গণকের সাহায্যে ব্যবহৃত নমুনার তেজস্ক্রিয়তা মাপা হয়। যে কোন পদার্থের বেলায় তাপ-সংদীপ্তি উৎপন্ন আলোর পরিমাণকে গড় তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া ভাগফল, পদার্থ দ্বারা নির্মিত বস্তুর বয়সের সঙ্গে অতিক্রান্ত বছরের সংখ্যার সমানুপাতিক। এখানে বস্তুর বয়স বলতে কি বুঝছি সেটা বুঝিয়ে বলি। মাটির পাত্রের ক্ষেত্রে সেটিকে ভাঁটিতে শেষবারের মতো আগুনে পোড়ানো হয়েছিল, সেইটাই তার যেন জন্ম সময়। আবার কোন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়ার সময়টাই তার জন্ম সময়।

চূড়ান্ত তথ্য বার করার আগে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হয়। বিকিরণ প্রয়োগে বিভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে; পদার্থ সমূহের এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা পরিমাণ করা প্রয়োজন হয়। আবার, ইলেকট্রনগুলোকে স্থানচ্যুত এবং অবরুদ্ধ করে করে তাপ-সংদীপ্তির সৃষ্টি করার পিছনে বিকিরণই একমাত্র কারণ নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, বস্তু থেকে নমুনা চূর্ণ প্রস্তুত করার সমস্ত যান্ত্রিক আঘাতের ফলেও নমুনাতে ছোট্ট মাপের দীপ্তি সৃষ্টি হতে পারে।

পুনর্বার কেলাসিত পদার্থ সমূহের বয়স আলোচ্য পদ্ধতির সাহায্যে বার করা যায় না। কারণ এই ধরনের পদার্থের বয়স যত কম অথবা বেশী হোক না কেন, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাপ-সংদীপ্তি নির্ভরশীল নয়। চূর্ণ পূর্ণ মাটিতে রাখার ফলে যে সমস্ত মাটির পাত্রের গায়ে লবণ চূর্ণ জমে গেছে সেই সমস্ত পাত্রের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

বয়স নির্ণয়ের আলোচ্য পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে আরিজোনাতে লাভা স্তরসমূহের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে। এই স্তরবিন্যাসে যে কোন স্তরের বয়স ঠিক উপরের স্তরটির বয়সের চেয়ে বেশী এবং ঠিক নীচের স্তরটির বয়সের চেয়ে কম। এই ধররেন ত্রিশটি লাভাস্তর বিন্যাসটিতে আছে। তাপ-সংদীপ্তি ভিত্তিক পদ্ধতিতে পাওয়া ফলাফলগুলি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা মিলে যায়; অর্থাৎ যে প্রবাহ যত প্রাচীন তার তাপ-সংদীপ্তিও তত বেশী। আপাতভাবে, স্তরগুলির বয়সের একটা মোটামুটি হিসাব এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

তাপ-সংদীপ্তির মাধ্যমে কাল নির্ণয়ের পদ্ধতিটিকে ভালোভাবে চালু করার আগে অনেক কাজ করতে হবে। এই পদ্ধতিটি বহু সম্ভাবনাময়। নমুনা প্রস্তুতির মতো কয়েকটি সমস্যার সমাধান করা গেলে ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে এই পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রসু হবে।

নিউ বুক স্টল ● ৬/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

ম্যাজিক মোমবাতি

যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার

১৯৫৪ সালে যখন প্রথম জাপানের ইয়াকোহামা শহরে যাই তখন ওখানকার অনেকের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠি। এই দলে যেমন সাধারণ নাগরিক ছিলেন তেমনি ছিলেন কিছু বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী আর বিজ্ঞানী। এদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাব হয় যে তারা কেউ না কেউ প্রায়ই আমাকে আমন্ত্রিত করতেন তাদের বিশেষ বিশেষ সভা-সমাবেশে এবং বৈঠকে।

এদেরই একজন। এক পদার্থ বিজ্ঞানী একদিন আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর পরীক্ষাগারে। তার ছাত্র-ছাত্রী আর সহকর্মীদের কাছে আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বলেছেন। এবার তাদের সবার সঙ্গে আমার সাক্ষাত-পরিচয় করিয়ে দেবেন, এই তার বাসনা।

তাঁর আমন্ত্রণে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলাম তাঁর লেবরেটারী বা পরীক্ষাগারে। আমার সম্মানে তিনি আয়োজন করেছেন এক ছোটখাটো চা পানের আসরের। চা পান শেষে সবার অনুরোধে দেখাতে হল দু চারটি ম্যাজিক। সবাই তারিফ করলেন ম্যাজিকের। সবাই বললেন ভারতের তেজিনা (ম্যাজিকের জাপানী প্রতিশব্দ) অতুলনীয়।

এর পর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর পরীক্ষাগারের ভিতর দিকে। ওখানে তাঁর কয়েকজন ছাত্র কি একটা বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। ওখানে পৌঁছুনোর পর ওর এক ছাত্র উঠে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—"আপনি তো বিরাট যাদুকর! অনেক বুদ্ধি আর অনেক চাতুর্য আপনার। আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন?"

তার এই বেয়াদপি দেখে আমাকে আমন্ত্রণকারী বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ছাত্রকে নিরস্ত করতে গেলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম—"দিন না ওকে বলতে।"

আমার কথায় উৎসাহ পেয়ে ছাত্রটি সামনের টেবিলের উপর জ্বালালো একটি ছোট মোমবাতি। তার পর মোমটা ভালভাবে জ্বলে উঠতে তার উপরে স্বাভাবিক ভাবে বসালো একটি কাচের চিমনী। সাধারণ তেলে জ্বলা টেবিল ল্যাম্পে যে রকম কাচের চিমনী ব্যবহার করা হয় তেমনি একটি চিমনীই সে ব্যবহার করলো। অল্পক্ষণ জ্বলার পর আপনা থেকেই মোমবাতিটা নিভে গেল চিমনীর ভেতরে। চিমনীটা তুলে নিয়ে সে মোমাবাতিটা জ্বাললো। আবার চিমনী ঢাকা দিল। এবারও অল্পক্ষণ পরেই নিভে গেল মোমবাতি।

এবার ছাত্রটি রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো—"সরকার সান, (জাপানী, প্রথায় মিঃ সরকার) মোমবাতি ও চিমনী যেটি যেমন আছে তেমনি অবস্থায় রেখে আপনি এমন কোন কৌশল করতে পারেন যাতে মোমবাতিটা নিভবে না। চিমনী তোলা চলবে না। এমন কোন যাদু কৌশল আছে আপনার?"

ছাত্রটির এই উদ্ধত আচরণে বিজ্ঞানী বন্ধুটি খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অস্বস্তিতে।

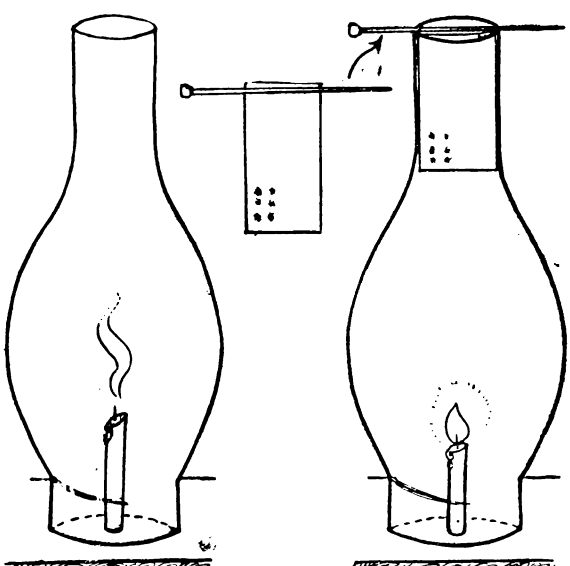

আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, "কিছু মনে করবেন না বন্ধু, বিজ্ঞানী যখন আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে সসম্মানে এত দূর নিয়ে এসেছেন তখন তাঁর ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা মেটানো তো আমার অবশ্য কর্তব্য। এক ফালি পাতলা টিন, উল বোনার কাঁটার মত একটা লোহার কাঠি আর একটা কাতুরী এনে দিন একটা ম্যাজিকের মন্ত্র প্রয়োগ করে দেখি।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞানী-বন্ধু ঐ সব সংগ্রহ করে ফেললেন। পাতলা টিনের ফালি এলো, কাতুরী এলো সঙ্গে এলো একটা ছোট মাপের উল-বোনা-কাঁটা। এই সব নিয়ে আমি কাজে লেগে পড়লাম সবার সামনে।

প্রথমে চিমনীর উপরের দিককার মুখের মাপটা মেপে নিয়ে আমি সেই মাপে চওড়া এমন এক ফালি টিন কেটে নিলাম। এর পর এই টিনের ফালিটা চিমনীর উপর দিককার খোলা মুখ দিয়ে গলিয়ে দেখলাম যে সেটা পুরো আঁট না হয়ে সহজে গলতে পারছে। চিমনীর মুখের ভেতরের মাপে চওড়া এই টিনের ফালি থেকে ইঞ্চি তিনেক অংশ কেটে নিয়ে তার একটা প্রান্ত বেঁকিয়ে নিলাম। এইভাবে বেঁকিয়ে নেওয়াতে উলের কাঁটা গলিয়ে এই টিনের ফালিটাকে পতাকার মতন করে ধরতে অসুবিধা হল না।

এর পর তুলি-কালি নিয়ে ঐ পতাকার চেহারার বস্তুটির উপরে বাংলায় লিখলাম 'সত্যমেব জয়তে'। জাপানীদের নিজেদের লিপিতে লেখার ব্যাপারে তুলি-কালির বহুল ব্যবহার। তাই সব জায়গাতেই তুলি আর কালি সহজ লভ্য।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে আমি ঐ ছাত্রকে বললাম, জ্বালো তোমার মোমবাতি, ঢাকা দাও চিমনীতে। দেখ আমার মন্ত্র লেখা পতাকার যাদু-কীর্তি।

মোমবাতি জ্বেলে চিমনী ঢাকা দিল ছাত্রটি। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিমনীর উপর দিককার মুখ দিয়ে মন্ত্র লেখা টিনের পতাকা গলিয়ে দিলাম। সেটা ঝুলে থাকলো চিমনীর ভিতরে। উলের কাঁটাটা থাকলো চিমনীর মুখের উপরে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে। হাত সরিয়ে নিলাম। উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করে আপন মেজাজে জ্বলে চললো চিমনীর ভেতরকার মোম। আগের মত কোন পরিবর্তনই ঘটলো না এর শিখায়। কমলোও না নিভলোও না। মোমবাতির শিখার মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বন্ধু-বিজ্ঞানীর মুখ। চুপসে এইটুকু হয়ে গেল ছাত্রটি। হাত বাড়িয়ে সে আমার হাত ধরে আবেগে দুবার নাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তার সহপাঠীরা বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে দেখালো অবজ্ঞা।

ঐ 'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রের গুণে নয়। এক বৈজ্ঞানিক সত্যের গুণেই আমিই রক্ষা পেয়েছিলাম ঐ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

দহনের ফলে চিমনীর ভেতরকার অক্সিজেন পুড়ে পরিণত হয় কার্বন ডাই অক্সাইডে আর চিমনীর নিচের দিকে জমতে থাকে। চিমনীর তলায় কোন ফাঁক না থাকাতে নতুন করে বায়ু ভেতরে ঢুকে দহন চালানোর মতন অক্সিজেন আর সরবরাহ করতে পারে না। এই সময় চিমনীর তলার মুখটা একটু উঁচু করে রাখা গেলে মোমবাতিটা জ্বলতে পারতো। কারণ এর ফলে তলা দিয়ে বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন ঢুকতো ভেতরে। কিন্তু ছাত্রটির শর্ত ছিল তোলা যাবে না। তাই আমাকে দেখতে হল ভিন্ন পথ। দেখতে হল উপরের মুখে কী করা যায়। এতক্ষণ মোমবাতির দহনের ফলে উৎপন্ন তপ্ত বায়ুর বস্তু বেরিয়ে যাচ্ছিল উপরের মুখ দিয়ে। এই উপরের মুখটাকে দু ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে দুই গোত্রের দুই বায়ু ধারার ভিন্ন ভিন্ন দুটো পথ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। হলও তাই।

জ্বলন্ত মোমবাতির উপরে চিমনী চাপা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর মুখে বইতে থাকলো দুটো বায়ু ধারা। এক ধারা ঊর্দ্ধমুখী উত্তপ্ত বায়ুর বস্তু। অন্যটি নিম্নমুখী অক্সিজেন-পুষ্ট শীতল বায়ু স্রোত। 'পতাকা' ঝুলিয়ে ভাগ করে দেওয়া চিমনী-মুখের দুই ভাগ দিয়ে বইতে শুরু করেছিল এই দুই ভিন্ন গোত্রের বায়ুর ধারা। এর ফলেই মোমবাতির সুষ্ঠু ও দীর্ঘায়িত দহন সম্ভব হয়েছিল। তার পরিচালনের মজার ব্যাপার এটা।

করে দেখ। খুব মজা পাবে। ঐ মন্ত্রের প্রভাব বলে প্রকাশ করলে এ হবে একটা ম্যাজিকের ব্যাপার।

যাদুসম্রাট এ, সি, সরকার, ম্যাজিক ভিলা ১২/৬, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩১

ধারাবাহিক উপন্যাস

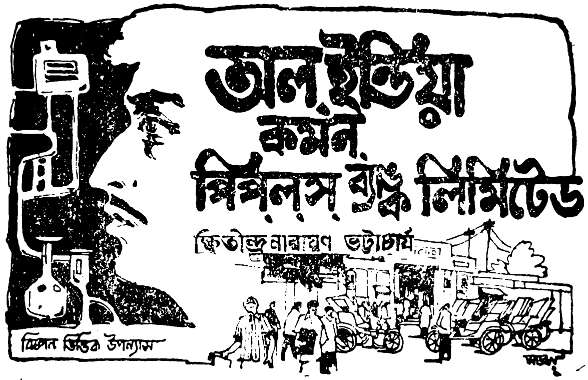

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। দেখতে দেখতে গোটা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। নাম মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী এবং খুব সহজেই সকলের মন জয় করে নিলেন। আলাপ হল সুশান্তর সঙ্গেও। ছোট শহরের জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে এল—একমাত্র সুশান্ত ও ক্যাশিয়ার ছাড়া। সরযূ-প্রসাদেরও কোন খবর নেই। লোকটা কি বেপাত্তা হয়ে গেল?

সুশান্তের ডাকে সতীনাথবাবু এসেই আবার কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি হঠাৎই আবার এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে—তা কোন মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

নয়

সতীনাথ বাবুর ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। অন্য দিন হ'লে সুশান্ত এর অনেক আগেই খেয়ে নেয়, কিন্তু আজ অতিথিকে ফেলে আগে খাওয়াটা ভালো দেখায় না তাই খবরের কাগজ নিয়ে ঈজি চেয়ারে বসে ছিল সময় কাটাবার জন্য।

কাগজে সেই একঘেয়ে সব খবর। একেবারে যেন বাঁধা গতে লেখা। সেই দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিক কর্মীদের গণমিছিল, কারণে অকারণে স্কুলে বা কলেজে বা আপিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওপরওয়ালাকে ঘেরাও করে রাখা, দেশের কোথাও না কোথাও দারুণ খরা—মাঠঘাট ফেটে চৌচির, চাষীর মাথায় হাত, আর তার কিছু দূরেই অন্য কোন এক জেলায় প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যা। ফসল চুলোয় যাক, লোকের প্রাণ বাঁচানোই সেখানে দায়। এ ছাড়া খাদে বাস্ উল্টে পড়া, লরীতে মোটরে মুখোমুখি সংঘর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক দিনের কাগজেই এগুলি থাকে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে সভাসমিতিতে তথাকথিত নেতাদের ছেঁদো বক্তৃতা হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান্ করেঙ্গা। কিছুই যে "করেঙ্গার" সাধ্য বা সম্ভাবনা নেই তা সবাই জানে। তবু নেতারা বলেন শ্রোতারা শোনে। হাততালিও দেয় তবে বিশ্বাস করে না।

পাতা উল্টিয়ে খেলার খবরের পাতায়ও নিত্য ঐ একই ঘটনার বিবরণ। খেলায় হেরে গেলে দলের "সাপোর্টারদের" গ্যালারি থেকে ইট পাটকেল ছোঁড়া, তার-পর মাঠে নেমে এসে রেফারির ওপর চড়াও হওয়া এবং শেষে পুলিশের "মৃদু" লাঠি সঞ্চালন এবং আহতদের হাসপাতাল প্রেরণ।

একটা এমন নতুন খবর নেই যা মানুষকে উৎসাহ দিতে পারে, কাজে প্রেরণা দিতে পারে। বিরক্ত হয়ে সুশান্ত কাগজটা পাশে রেখে দিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় কাগজটা মাটিতে পড়ে গেল। নীচু হয়ে তুলে রাখতে গিয়ে আরও একটা খবরের দিকে নজর পড়ল। খোদ রাজধানীর বুকে দিনে দুপুরে শত শত লোকের নাকের ডগায় চার পাঁচটি ছোকরা ব্যাঙ্কে ঢুকে রিভলভার দেখিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে গেছে। কেউ এগিয়ে বাধা দেবার সাহস পায়নি। এটাও তো এখন প্রায় প্রতিদিনের খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে! সুশান্ত ভাবল তাদের ব্যাঙ্কেও তো ডাকাতি হয়ে গেল। কিন্তু ও-ভাবে নয়

কেমন নিঃশব্দে, কাউকে না জানিয়ে ভোজবাজীর মত কাণ্ডটা ঘটে গেল, আর ও নিজেই হ'ল তার ভুক্তভোগী। অথচ ও তো জানে ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু ব্যাপারটা কী আশ্চর্য রহস্যময়। দেখা যাক, সতীনাথ কাকা কোন একটা সুরাহা করতে পারেন কিনা।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসছিল তার। বোধ হয় ঈজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল সে। হঠাৎ গেটের সামনে রিক্সা থামার আওয়াজে চমকে উঠল। হ্যাঁ, সতীনাথ কাকাই বটে। কিছু কি হদিশ পেয়েছেন রহস্যের? মুখের ভাব তেমনি অমায়িক—ঠিক যেমনটা দেখেছিল সকালের দিকে। নাঃ, এই ডিটেকটিভগুলো এক আজব চীজ। মুখ দেখে মনের ভাব আঁচ করবে এমন সাধ্য নেই কারো।

"কি হে, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছ তো? অ্যাঃ, আমার জন্য না খেয়ে বসে আছে! পাগল ছেলে। আমাদের কি নাওয়া খাওয়ার সময়ের কিছু ঠিক আছে? নাও নাও, আর দেরী ক'র না। ভগ্‌লুকে বল তাড়াতাড়ি অতিথি সৎকারের পুণ্যার্জনটুকু করে নিক।' জামা খুলতে খুলতে হাসিমুখে বলে চললেন সতীনাথ বাবু।

খাওয়াদাওয়ার পর সতীনাথ বাবুই কথাটা পাড়লেন। —"আজই রাত্রির ট্রেনে ফিরে যেতে হবে। ওদিকে অনেক জরুরি কাজ ফেলে এসেছি। অবশ্য এখানেও একটু এগোনো গেছে। তবে হয়তো আরও দু'একবার আসতে হতে পারে।"

একটু থেমে বললেন, "তোমাদের শহরের পুলিশের কর্তাদের সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় হ'ল। বড়কর্তা লোক খারাপ নয়। তবে একটু ভোঁদা গোছের।"

"ভোঁদা! পুলিশের লোক কখনও ভোঁদা হতে পারে?" —সুশান্ত সবিস্ময়ে বলল।

"হ্যাঁ রে! ভোঁদা হবে না? কবিতা লেখে যে! আমাকে নিজের লেখা কয়েকটা কবিতা পড়ে শুনিয়েও দিয়েছে।"

"কবিতা লিখলেই কি ভোঁদা হয়?" সুশান্ত নিজেও অবসর সময়ে একটু আধটু কবিতা লেখে। কয়েকটা কবিতা কোন কোন লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়েছে। তাই তার মনে ঘা লাগবারই কথা।

"না না, ছিঃ। কবিতা লিখলেই ভোঁদা হবে কেন? তা হলে এত সব নামকরা কবি, সবাইকেই উড়িয়ে দিতে হয়। আর আমি নিজেও তো লিখতে না পারলেও কবিতা খুব পছন্দ করি। বিজ্ঞান চর্চা আর গোয়েন্দাগিরির ফাঁকে ফাঁকে যখন মনটা একটু বিশ্রাম চায় তখন তো আমি কবিতা পড়েই আনন্দ পাই। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, মাইকেল, শেলী, কীট্‌স্, মায় শেক্সপীয়ার কাউকেই ছাড়ি না। তবে—তবে হ্যাঁ, কোন পুলিশ যদি কবিতা লিখতে বসে তখনই আমার কেন যেন তাকে ভোঁদা ভোঁদা মনে হয়। আমার মনে হয় পুলিশগিরি আর কবিতা লেখা এদু'টো একেবারে বিপরীতধর্মী কাজ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "কন্‌ট্রাডিক-টারি", তাই না? আচ্ছা, ভেবে দেখ তো আমরা ডাক্তারদের মধ্যে কবি পেয়েছি, এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যেও পেয়েছি, পেয়েছি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। কিন্তু কোন পুলিশ কবির কথা কোন দিন শুনেছ? একটা নাম বলতে পার?"

সুশান্ত একটু চিন্তা করে বলল, "এখন মনে পড়ছে না, তবে ভাবলে হয়তো দু'একজনের নাম নিশ্চয়ই পাব।"

"না পাবে না। কারণটা তো বললামই। যদি কারও পুলিশ হয়েও ভালো কবি হবার সাধ হয় তবে তাকে পুলিশি কাজে ইস্তফা দিতে হবে। আর, কোন কবিকে যদি দৈবাৎ পুলিশের কাজ নিতে হয় তবে দেখবে দুদিন বাদেই সে কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে কেন, একদম ভুলে গিয়েছে বললেই ঠিক বলা হবে।"

"কাকা, আপনি বড় বাড়িয়ে বলছেন। এ আপনার মন-গড়া কথা।"

সতীনাথ বাবু সোজা উত্তর না দিয়ে আর একবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

"যাক, তোমাদের সৌভাগ্য, তোমরা এখানে একজন কবিতা লেখক,—কবিতা-লেখক কেন, কবি-পুলিশই পেয়েছ। কবিরা সাধারণতঃ দিলখোলা গোছের লোক হয়, এখানকার বড়কর্তাটিও দেখলাম তাই। একটু চেপে-চুপে থাকা,—যা এসব কাজে অবশ্য করণীয়, সেটার কিছু অভাব আছে মনে হ'ল। সে যে ঐ কবিতা লেখার বাতিকের জন্য তা দিব্যি করে বলতে পারি।"

সতীনাথ বাবু আবার একবার অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়ে তুললেন।

হাসি থামলে বললেন, "তবে এখানকার পুলিশের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি অর্থাৎ ছোট কর্তা, কি নাম যেন? হ্যাঁ, মদসূদন গুপ্তা অর্থাৎ মধুসূদন গুপ্ত। বাঙ্গালী নন, কারণ তা হলে মকৃসূদন বলতেন না, মদ্‌সূদন্‌ই বলতেন, আর গুপ্তও হ'ত গুপ্ত। তা যাই হোক, লোকটি মনে হ'ল বেশ চৌকস। সত্যিকার পুলিশের যে সব গুণ থাকা দরকার সবই আছে ওঁর মধ্যে। মিতভাষী, মনের কথা সহজে ভাঙ্গতে চান না, অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে খুব রাশভারি

গলায় বলেন। একটাও বাজে কথা বলেন না, আর—"

সুশান্ত ধরিয়ে দিল,—"আর কবিতাও লেখেন না।"

সতীনাথ বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক বলেছ। কবিতা লেখা তো দূরের কথা, কবিতা পড়াটাও বোধ হয় এ ব্যাপারে একটা বড় বাধা। আর সে বাধা মদসূদন বাবু নিশ্চয়ই জয় করেছেন। ও'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাই তো মনে হ'ল। আমি অবশ্য দু'জনের কাছ থেকেই বেশ আদর আপ্যায়ন পেয়েছি।"

এর পরই সতীনাথ বাবুই কেমন মেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। সুশান্ত যে আরও কিছু শুনবার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে খেয়ালও হ'ল না তাঁর।

খানিকক্ষণ ঐ ভাবে কাটল। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিয়ে পেয়ে বললেন, "একটা কথা ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তা কাজ একটু এগিয়েছে বৈকি! এর পরবর্তী ভূমিকা আমাদের কি হবে তাই নিয়ে একটু আলোচনা হ'ল। বড়কর্তার ওপর বেশি ভরসা করিনি, কিন্তু ছোটকর্তার হালচাল দেখে মনে হ'ল তিনি এ কেস্‌টা খুব সিরিয়াস্‌লি নিয়েছেন এবং এর রহস্যটা বার করার জন্য সত্যি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথা শুনলাম, আমিও কিছু পরামর্শ দিলাম। এইতেই দেরী হয়ে গেল।"

"এইতেই এতক্ষণ লাগল?"

"না না, ভালো কথা, ফিরবার পথে তোমাদের ব্যাঙ্কটাও আর একবার ঘুরে এলাম। পরিচয় দিই নি, ও'রাও আমাকে চিনতে পারেন নি। একটা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টও খুলে এলাম ব্যাঙ্কে। নামটা অবশ্য অন্য দিয়েছি।"

"সে কি! অ্যাকাউণ্ট খুলতে গেলে কোন পরিচিত লোকের সনাক্তিকরণ লাগবে না?—আইডেণ্টিফিকেশন্?"

"সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ওটা দরকার হয় না সব ব্যাঙ্কে। তোমাদের ব্যাঙ্কেও এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। এটা তোমার জানা উচিত ছিল।"

সুশান্ত লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি যতগুলি নতুন অ্যাকাউণ্ট খুলিয়েছি সবেতেই ব্যাঙ্কের কোন চেনা লোককে দিয়ে সনাক্ত করিয়ে নিয়ে তবেই করেছি। তবে ও কাজটা বেশির ভাগ তো অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টই করতেন।"

'অ্যাঃ, আমার জন্য না খেয়ে বসে আছে! পাগল ছেলে!'

"হ্যাঁ, জানি। তবে আমি কিন্তু আমার নতুন নামে একটা সনাক্তিকরণ করিয়ে নিয়েই অ্যাকাউণ্ট খুলেছি। পুলিশ যার সহায় তার পক্ষে এ কাজটা একটুও কঠিন নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমি বললে ও'রা সাদা কাগজেই "আইডেণ্টিফায়েড', বলে একটা সই করে দেবেন। তবে বড়কর্তার ওপর ভরসা করিনি, ছোটকর্তাই এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তবে তিনি নিজেও সই করেন নি, কাউকে দিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহের সুযোগ দেবার লোক তিনি নন।"

"কিন্তু এখানে তো আপনি থাকেন না, থাকবেন না। এখানে আবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট—"

"এঃ, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট থাকলে যখন খুশি নিজের কাজের গরজেই ব্যাঙ্কে আসা-যাওয়া চলে। কেউ সন্দেহ করবার কোন কারণ খুঁজে পায় না, তা ছাড়া আজই চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আরও দু'-একবার আসতে হবে বলে মনে হয়।"

"কিন্তু আপনাকে চিনে ফেললে ওরা কি সতর্ক হয়ে যাবে না?

"তা যাবে, কিন্তু চিনতে পারলে তো? এখানে তোমার কাছে আমি যে বেশে রয়েছি বাইরে তো তা থাকি না, এই দেখ আমার অ্যাটাচি কেসের একটা গোপন খাঁজে এমন কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট জিনিস লুকানো আছে যাতে মুহূর্তের মধ্যে আমার চেহারা বদলে ফেলা যায়। অতি সামান্য একটু মেক্ আপ্ মাত্র। ছোট্ট একটা সরু গোঁফের রেখা কিংবা ছোট্ট একটু বাটার ফ্লাই গোঁফ—যাকে বলা হ'ত হিটলারি গোঁফ বা চার্লি চ্যাপলিনি গোঁফ। এ ছাড়া থুঁতনির কাছে ছোট্ট এক কুচো দাড়ি, চোখের ওপর একটু নকল ভুরু, চুলে একটু পাক ধরানো—এ সব তো কয়েক সেকেণ্ডের কাজ। ওগুলির মধ্যেই আঠাটা এমন ভাবে লাগানো যে একটু সেঁটে দিলে আর কারও সাধ্য নেই টেনে খোলে। একটা কৌশল আছে খুলবার, সেটা শুধু আমার জানা। সেটার সাহায্যে আমি যেমন চট্‌পট্ লাগাতেও পারি তেমনি চট্‌পট্ খুলতেও পারি। অনেক টাকা খরচ করে এ সব আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আনিয়েছি। ওখানে তো এসব দরকার হয় খুব বেশি। সেবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়েও কিছু যোগাড় করে এনেছি। এখানকার পুলিশ মহাপ্রভুরাও আমার এই সাদাসিধে পোশাক দেখে চিনতে পারবে না যে একটু আগে তাদের কাছে যে লোকটি হাজির হয়েছিল সেই একই ব্যক্তি,—যাকে তারা সতীনাথ বাবু বলে জানে।"

সুশান্ত এবার যেন একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই সতীনাথ বাবুকে দেখতে লাগল।

সতীনাথ বাবু বললেন, "ভালো কথা, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলতে গিয়ে তোমাদের নতুন ম্যানেজারটির সঙ্গেও আলাপ করে এলাম। কি যেন নাম, হ্যাঁ মিঃ ত্রিবেদী।"

"কেমন দেখলেন? বেশ ভদ্র বলে মনে হয় না?"

"নিশ্চয়। ভদ্র তো বটেই। আর চেহারার মধ্যেও বেশ একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একেবারে টুকটুকে আপেলের মত রঙ। মুখখানা আরও লাল। আর বেশ মিশুক এবং যাকে বলে কেমন একটু গদগদ ভাব। কি ভাবে আপ্যায়ন করবেন তা যেন ভেবেই পান না।"

"তবে একটা জিনিস লক্ষ করেছেন?"

"করেছি বৈ কি! কথায় কথায় একটু বেশি ইংরিজি বলেন, এই তো? ও কিছু না, কিছু দিন ও-দেশে ঘুরে আসার লক্ষণ, আমি যখন বিলেত যাই তখন আমারও ঐ অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে অভ্যেস পরে কেটে গেছে, ও'রও যাবে। তা ছাড়া হিন্দী আর বাংলা দু'টোই বেশ ভালো বলতে পারেন দেখেছি।"

"ত্রিবেদী কি বাংলা নাম?"

"হতে পারে। বিহার বা ইউ, পি হলে বলত তেওয়ারী। যদিও দু'টি একই কথা, অবশ্য ও'দেরও কেউ কেউ নিজেদের নাম বলতে ত্রিবেদীও বলেন। বাঙ্গালীরা অবশ্য সকলেই ত্রিবেদী বলে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকে যদি রামেন্দ্রসুন্দর তেওয়ারী লিখি, যদিও হয় তো ভুল হত না, কেন না ও'রা ঠিক বাঙ্গালী ছিলেন না চিরকাল, কিন্তু তোমরা, বাঙ্গালীরা কি খুশি হতে?"

"যাক্, ত্রিবেদীর সঙ্গে তা হলে আলাপ হল?"

"আলাপ? দস্তুর মত সদালাপ, বিশ্রম্ভালাপও বলতে পার। ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করলে মনে হয় যেন একটা নন্-স্টপ্ এঞ্জিন চলছে। তবে যতটা দিলখোলা বলছ ততটা নাও হতে পারে। ভেতরে ভেতরে কিছু মতলব আছে কিনা কে জানে! অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র, ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়। আমরা, ডিটেক্‌টিভরা তাই সব কিছুই একটু বাজিয়ে নিতে চেষ্টা করি। ত্রিবেদীর বেলাও উদ্দেশ্যটা আমার ছিল তাই। তবে এখন পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে কিছু পাই নি। তবু, অবিশ্বাসীর মন তো, একটু ওয়াচ্ করা আর কি!"

"কিন্তু আজ রাতেই তো চলে যাচ্ছেন বললেন?"

সুশান্ত পাঞ্জাবীটা মাথায় গলিয়ে দিতে দিতে বলল, "নিশ্চয় যাব, আমিও তৈরি।"

[ক্রমশঃ]

গোকা থেকে গাছ

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বক কহে কচ্ছপে "বাহবা—কি ফুর্তি,
অতি খাশা—আমাদের বকচ্ছপ মুর্তি"

সুকুমার রায়ের বিখ্যাত কবিতা "খিচুড়ী'তে এই পংক্তিটি আছে। তোমরা নিশ্চয় তা পড়েছ। প্রকৃতির কারখানায়—এরকম জিনিসও দুষ্প্রাপ্য নয় তারই উদাহরণ হ'ল এই পোকা গাছ বা পোকা থেকে গাছ।

শোঁয়া পোকা থেকে প্রজাপতি হয় এ আমরা জানি। শোঁয়া-পোকাকে দেখতে একটি ছোট কাঠির মত। শরীরটা খুবই নরম, পেটের তলায় দুই সারি পা। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সর সর করে চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়। গাছের নরম পাতা ও ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে। কিছু দিন এভাবে ঘুরে বেড়ানর পর এক সময় গুটি পাকিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। নড়ন চড়ন নেই। কিছু খায়ও না। গায়ের ওপর একটা খোলস তৈরী হয়ে যায়। কিছু দিন পরে পোকাটা প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে—খোলস ভেঙ্গে উড়ে যায়। শোঁয়া পোকা অনেক রকমের আছে। সকলেই এই রকম খোলস তৈরী করে বা গুটি বাঁধে। রেশমের পোকা গুটি বাঁধে। রেশমের পোকায় গুটি একটু অন্য রকম। চীন দেশে এক রকম গুটি পোকা আছে সেগুলোতে দেখা যায়—গুটি বাঁধার আগেই তাদের মুখের মধ্যে দিয়ে একটি সরু ঘাসের পাতার মত জিনিস বেরিয়ে আসে। লোকে মনে করল এটা ঘাস ছাড়া কিছু নয়। চীনের লোকেরা নাম দিল "হিয়া-সাও-টং চং" অর্থাৎ শীতের পোকা গরমের ঘাস। আসলে এটা ঘাস নয়—ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম "কর্ডাইসেপ্‌স্‌" (Cordyceps)।

শোঁয়া পোকা থেকে যে প্রজাপতি হয় সেই প্রজাপতি যে ডিম পাড়ে তা থেকে আবার সেই শোঁয়া পোকাই জন্মে। কারণ এখানে একই প্রজাতির রূপান্তর হচ্ছে। হিয়া-সাও-টং চং এর বেলায় একেবারে অন্য রকম। এখানে পোকার শরীরে ছত্রাকের বীজাণু অঙ্কুরিত হয়ে ছত্রাকটি পরাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকে আর পোকাটি মরে যায়। ছত্রাকের বীজাণু, পোকার শরীরে সংক্রামিত হলে পোকাটি কিছুতেই তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না। ছত্রাকটি পোকার শরীরের অভ্যন্তরে সেই পোকার মাংস খেয়েই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পোকার উপরকার চামড়া নষ্ট হয় না কিন্তু ভিতরটা সবটাই ছত্রাকের অংশে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন ছত্রাকের বীজাণু হওয়ার সময় হয়। বীজাণুগুলি একটি অতি সুক্ষ্ম কাঠির মত—শাখাতে হয়। সেই শাখাটি মৃত পোকার মুখ বিবর দিয়ে বাইরে উঁচু হয়ে থাকে। সাধারণতঃ একটি শাখা বের হয় কদাচিৎ দুটি শাখা হয়। শাখার উপরের বীজাণুগুলি একটি কোষের মধ্যে থাকে আর সুপক্ক হলে কোষ বিদীর্ণ করে হাওয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় যে যে বীজাণু শোঁয়া পোকার উপরে পড়ে সেগুলি অঙ্কুরিত হতে পারে আর যেগুলি কোনও শোঁয়াপোকার উপরে পড়ে না সেগুলি শুকিয়ে যায়। আর যে পোকাগুলি দৈবক্রমে ঐ বীজাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় সেগুলি সময় মত গুটি বাঁধে আর তার থেকে প্রজাপতির জন্ম হয়। আবার সেই প্রজাপতি থেকে শোঁয়া পোকা হয়। এই হল এদের জন্ম বৃত্তান্ত।

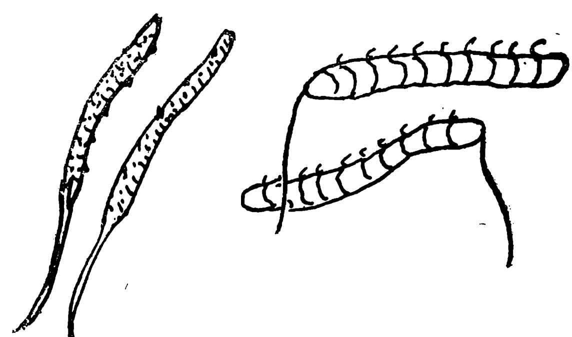

শোঁয়া পোকায় শরীরের মধ্যে থেকে কর্ডাইসেপস্‌ ছত্রাকটি যখন পোকার সব মাংস খেয়ে শেষ করে দেয় তখন খাদ্যাভাবে নিজেও মরে যায়। তখন মনে হয় পোকাটাই শুকিয়ে মরে পড়ে আছে। এই শুষ্ক বস্তুটি কিন্তু মোটেই তুচ্ছ জিনিস নয়। খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে এর চাহিদা আছে। চীনারা নানাভাবে রন্ধন করে খায় আর মাংসের ঝোলে ফোঁড়ন দিলে সেই মাংসের ঝোলের স্বাদ অতি অপূর্ব হয়ে থাকে। হাঁপানির অসুখে হিয়া-সাও-টং চং একটি মহৌষধ। ক্ষয়কাশ বা যক্ষা রোগেও এর উপকারিতা আছে। সাধারণ ভাবে এটি বলকারক এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী। চীন দেশে, এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশের কোন কোন দ্বীপেও অস্ট্রেলিয়ায় কর্ডাইসেপস্‌ পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন তিব্বতেও পাওয়া যায়। খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য চীন দেশের বাজারে আঁটি বেঁধে বিক্রী করে! চীন দেশ থেকে অন্যান্য দেশের চীনা নাগরিকদের জন্য এই পোকা গাছ রপ্তানি হয়। কলকাতার চীনারাও এটা ব্যবহার করেন।

---

৩৯১ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া-৩

লিথিয়ামের গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

হাইড্রোজেন যেমন সবচাইতে হাল্কা গ্যাস ঠিক তেমনি সব চাইতে হাল্কা ধাতু হ'ল লিথিয়াম। রূপোর মতো সাদা ঝকঝকে এই ধাতু। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস ছাড়া লিথিয়ামের মতো এত হাল্কা মৌলিক পদার্থ দুনিয়াতে আর নেই। আর ঠিক মাখনের মতো নরম এই লিথিয়াম—একে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলাও যায় অনায়াসে।

লিথিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেছিলেন আর্ভফেডসন নামে একজন সুইডিশ বিজ্ঞানী। অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীরা 'পেটালাইট' খনিজ পদার্থকে বিশ্লেষণ করে ওর মধ্যে কি কি বস্তু থাকতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

আর্ভফেডসন যতবারই এই 'পেটালাইট' খনিজ বস্তুকে বিশ্লেষণ করেন ততবারই ঐ খনিজের বিভিন্ন পদার্থের যোগফল দাঁড়ায় ৯৬%; আর্ভফেডসন পড়লেন মহা ভাবনায়। তাহলে বাকী আর ৪% পদার্থ গেল কোথায়? আসলে ঐ গোলমেলে হিসেব না মেলা ৪% এর কারণই হল লিথিয়াম ধাতু। ওই ধাতুটি যে পেটালাইট খনিজের মধ্যে থাকতে পারে সেটা তখন কারো মাথাতেই আসেনি। আর্ভফেডসন বারে বারে পরীক্ষা চালিয়ে এই নতুন মৌলিক পদার্থকে আবিষ্কার করলেন। সেটা ১৮১৭ সালের কথা।

কেউ জন্ম গ্রহণ করলে যেমন আমরা সেই নবজাতকের নামকরণ করে থাকি, তেমনি কোনও বৈজ্ঞানিক নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেই জিনিসের একটা নতুন নাম দেন। লিথিয়াম হচ্ছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সমগোত্রীয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের জৈব রাসায়নিক থেকে। কিন্তু এই নতুন ধাতু লিথিয়ামকে পাওয়া গেল একটা খনিজ পদার্থ থেকে। তাই এই ধাতুর নামকরণও হল তার উৎসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। লিথিয়াম শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। গ্রীক ভাষায় লিথোস (Lithos) শব্দের অর্থ হচ্ছে—পাথর।

পরে অবশ্য আর্ভফেডসন এই নতুন ধাতুকে আরও নানাধরনের খনিজের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ বুনসেন এবং বৃটিশ পদার্থবিদ ম্যাথেসন আলাদা আলাদা ভাবে বিশুদ্ধ লিথিয়াম আবিষ্কার করলেন। কি ভাবে জান? গলিত লিথিয়াম ক্লোরাইড লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে। আগেই বলেছি ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা হচ্ছে লিথিয়াম। এখানে তার অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ধাতু নেই। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে সামান্য এক অণু জলের ওজনের চাইতে লিথিয়ামের ওজন প্রায় অর্ধেক। এ্যালুমিনিয়াম লিথিয়ামের চাইতে প্রায় পাঁচগুণ বেশী ভারী, লোহা ১৫ গুণ এবং অসমিয়াম ৪০ গুণ বেশী ভারী।

সাধারণ উষ্ণতায় লিথিয়াম বাতাসের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের সাথে দারুণ তেজের সাথে ক্রিয়া করে। একটা কাচের পাত্রে কিছুটা লিথিয়াম নিয়ে যদি তুমি তার মুখ কাচের ছিপি দিয়ে আটকে দাও তাহলে এক ভারী মজার ব্যাপার ঘটবে। কাঁচের পাত্রের সমস্ত বাতাসকে এই ধাতু শুষে নেবে ম্যাজিকের মতো। তখন বাইরের বাতাসের চাপে ঐ পাত্রের ছিপিটা এত জোরে আটকে যাবে যে ওটা খুলতে একজন মস্তবড় পালোয়ানকে ডাকার দরকার হতে পারে। আর সেইজন্যেই লিথিয়ামকে সংরক্ষণ করাও এক সমস্যার ব্যাপার। সোডিয়াম ধাতুকে যেমন কোরোসিন অথবা গ্যাসোলিনের মধ্যে নিশ্চিন্তে ডুবিয়ে রাখা যায়—লিথিয়ামের বেলায় তা করা যায় না। এই দারুণ মজার ধাতুটা তাহলে কোরোসিনের উপর ভেসে এসে দপ্ করে জ্বলে উঠবে। তাই লিথিয়ামকে লম্বা লম্বা কাঠির মতো করে কেটে ভেসলিন অথবা প্যারাফিনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্যারাফিন বা ভেসলিন এখানে লিথিয়ামের আস্তরণের কাজ করে।

লিথিয়াম হাইড্রোজেনের সাথে খুব তাড়াতাড়ি যুক্ত হতে পারে। খুব সামান্য পরিমাণে লিথিয়াম বিশাল আয়তন হাইড্রোজেনের সাথে কেমন করে সংযুক্ত হয় যে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মাত্র এক কেজি লিথিয়াম হাইড্রাইড (লিথিয়াম ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ)-এর মধ্যে প্রায় ২৮০০ লিটার হাইড্রোজেন রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে আমেরিকার আকাশ-সৈন্যরা এই লিথিয়াম হাইড্রাইড সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করত আপদকালীন রক্ষা-কবচ হিসাবে। লিথিয়ামকে জলের মধ্যে ডোবালে, সোডার বোতল খুললে যেমন হিস হিস শব্দ হয়, ঠিক তেমন শব্দ হতে থাকে আর হাইড্রোজেন গ্যাস বেরোয়। জলের উপর দিয়ে উড়বার সময় কোনও কারণে প্লেন দুর্ঘটনায় পড়লে সৈন্যরা লিথিয়াম হাইড্রাইড জলের সংস্পর্শে এনে হাইড্রোজেন তৈরী করত। এইভাবে

হাইড্রোজেনের বেলুন, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখন তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাত।

সাবমেরিনে বাতাসকে বিশুদ্ধ করার কাজেও লিথিয়াম ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।

লিথিয়াম অন্য যে সমস্ত ধাতুর সাথে এ্যালয় বা ধাতু-সংকর গঠন করে তা হ'ল সীসা-লিথিয়াম (Bahn metal) এ্যালয়। এটা খুব ভাল ঘর্ষণ-প্রতিরোধী (anti friction) বস্তু। এছাড়া লিথিয়াম অন্য যে সব ধাতুর সঙ্গে মিশে ধাতুসংকর উৎপন্ন করে তারা হচ্ছে—এ্যালুমিনিয়াম, বেরিলিয়াম, তামা, দস্তা ও রূপো। ম্যাগনেসিয়াম ও লিথিয়ামের ধাতুসংকর তাদের হাল্কা ওজনের জন্যে প্রযুক্তিবিদ্যায় খুবই কাজে আসবে বলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের সময় লিথিয়ামকে অনুঘটক হিসাবে কাজে লাগান হয়।

কিছুদিন আগেও এ্যালকালাইন (ক্ষারীয়) স্টোরেজ ব্যাটারী তৈরী করতে শুধুমাত্র সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ ব্যবহার করা হোত। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাত্র কয়েক গ্রাম লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই স্টোরেজ ব্যাটারীর জীবনীশক্তি তিন গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

লিথিয়ামের কিছু জৈব যৌগিক পদার্থকে মেশিনের যন্ত্রপাতি মসৃণ রাখার জন্য 'লুব্রিকান্ট' হিসাবে সুন্দর ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের দামী কাচ তৈরী করতেও লিথিয়াম এখন অপরিহার্য। টেলিভিশনের পিকচার টিউব-এর কাচ এই লিথিয়ামের সাহায্যেই তৈরী করা হয়। লিথিয়াম ফ্লুরাইড (Lithium fluoride)-কে জ্যোতির্বিদরা নতুন ধরনের টেলিস্কোপ তৈরী করতে কাজে লাগাচ্ছেন। বেগনী রঙের আলোতে (আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি) এই লিথিয়াম ফ্লুরাইড সবচেয়ে বেশী স্বচ্ছ বস্তু বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ ছাড়া লিথিয়াম ধাতু যে এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কতো কাজে আসছে তা বলে শেষ করা যাবে না। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে, গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী, চশমার লেন্স এমন কি খুব ভালো ব্ল্যাক-বোর্ড তৈরী করতেও লিথিয়াম চাই। প্রসাধনের সৌখিন ক্রিমও লিথিয়াম দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন 'এ' এবং হাঁপানি চিকিৎসার ওষুধ তৈরী করতেও লিথিয়াম না হ'লে চলে না। মানসিক ব্যাধিতেও লিথিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা সুফল পেয়েছেন।

রকেটে শক্তিশালী জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোজেন দরকার হয়। এই হাইড্রোজেন লিথিয়ামের মধ্যে বন্দী করে নিরাপদে রকেটে নেওয়া যায়। লিথিয়াম খুব হাল্কা বলে রকেটে নিতে সুবিধাও হয় খুব। হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে বিস্ফোরণ ঘটাতেও চাই লিথিয়াম।

আবিষ্কারের একশো পঁচিশ বছরের মধ্যেও যে ধাতুকে বিজ্ঞানীরা বিশেষ কোনও কাজে লাগান নি—আজ সেই ধাতুই আমাদের হাজার রকম ব্যবহারে কাজে লাগছে।

গভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক-এল, ফ্লাট-৭
সাহাপুর, (নিউ আলিপুর), কলিকাতা-৩৮

ছবির মজা / প্রণব হোড়

● মজার ছবি

প্রনব হোড়

জীবনদায়ী গ্যাস ঃ অক্সিজেন

অমরনাথ রায়

জলের অপর নাম 'জীবন'। ঠিক কথাই। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস কি জীবনদায়ী নয়? মুমূর্ষু রোগীর যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন তা লাঘব করার জন্যে ডাক্তারবাবু রোগীকে অক্সিজেন দেন। সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযাত্রীরা যখন রওনা হন তখন সঙ্গে নিয়ে যান অক্সিজেন গ্যাস ভর্তি সিলিণ্ডার। ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে যতই উপরে ওঠা যায়, বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ততই কমতে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে পর্বত শৃঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এতই কম যে সেখানে বায়ুতে অক্সিজেনের অপ্রতুলতার জন্যে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া অক্সিজেন ভর্তি সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে অভিযাত্রীরা তখন প্রাণ বাঁচান। আমরা যখন শ্বাস নিই তখন আমাদের ফুসফুসে বাতাস ঢোকে। বাতাসের কিছু অক্সিজেন আমাদের শরীর শুষে নেয়। প্রাণ-বায়ু রূপে অক্সিজেন আমাদের দেহে তাপ সরবরাহ করে এবং রক্ত পরিশ্রুত করে। ফলে মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্মশক্তির সৃষ্টি হয়। জলে অক্সিজেন গ্যাস স্বল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। জলচর প্রাণী জলে দ্রবীভূত এই অক্সিজেন কানকোর সাহায্যে গ্রহণ করে শ্বাস নিয়ে বাঁচে। ডুবুরীরা যখন জলের নীচে নামেন তখন গ্যাস মুখোশের সাহায্যে সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে শ্বাসকার্য চালিয়ে যান। এতো কথা বলার অর্থ হচ্ছে, অক্সিজেন যে জীবনদায়ী গ্যাস সেটা প্রমাণ করা।

অক্সিজেন কি শুধুই জীবনদায়ী গ্যাস? আর কোন কাজে কি এ গ্যাস লাগে না?—লাগে বৈকি। অনেক কাজেই লাগে। উচ্চ চাপে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস একত্রে মিশিয়ে জ্বালিয়ে দিলে যে দীপশিখা উৎপন্ন হয় তার উষ্ণতা প্রায় 2800 ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই শিখাকে বলা হয় অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা। খুব শক্ত ধাতুর পাত কাটা বা জোড়া লাগাবার কাজে এই শিখা ব্যবহার করা হয়।

অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস একত্রে মিশিয়ে জ্বালালে যে শিখা উৎপন্ন হয়, তার নাম অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা। এই শিখার উষ্ণতা প্রায় 3200 ডিগ্রী সেলসিয়াস। বিভিন্ন ধাতু গলানো এবং ধাতুর পাত জোড়া লাগানোর জন্যে এই শিখা ব্যবহৃত হয়। গ্যাস-ওয়েল্ডিং-এর দোকানে

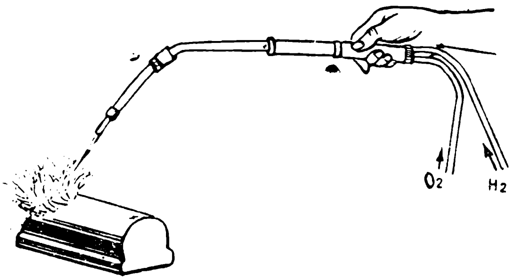

চিত্র নং—১

গেলে তোমরা দেখতে পাবে, কি ভাবে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখাকে কাজে লাগানো হয়। আবার সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের পণ্যোৎপাদনেও প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হয়। এ ভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং শিল্পের প্রয়োজনে নিম্ন উষ্ণতা সৃষ্টি করবার কাজে তরল অক্সিজেন (স্ফুটনাংক—183 ডিগ্রী সেলসিয়াস) ব্যবহার করা হয়। সূক্ষ্ম কাঠকয়লা চূর্ণ অক্সিজেন শোষণ ক'রে এমন একটি বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করে, যা খনির খনন কার্যে ব্যবহৃত হয়। বার্নিশ প্রস্তুতিতে তেলকে ঘন করতেও অক্সিজেন লাগে। অক্সিজেনের জন্যে ভূপৃষ্ঠে আমাদের পক্ষে আগুন জ্বালানো সম্ভব হয়।

এখন তোমরাই বল, অক্সিজেন সত্যিই অতি প্রয়োজনীয় গ্যাস কিনা। এ হেন গ্যাসটির পরিচয় জানতে কার না ইচ্ছা হয় বল। আর সেই পরিচয়টা দেবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আয়তন হিসাবে বায়ুর পাঁচ ভাগের মধ্যে এক ভাগই অক্সিজেন। আর বায়ুই হলো মুক্ত অক্সিজেনের প্রধান ভাঁড়ার। ভূপৃষ্ঠের বস্তুরাজির প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগই অক্সিজেন। ভূপৃষ্ঠের সমগ্র পদার্থের প্রায় অর্ধেকটাই অক্সিজেন। আবার ওজন হিসাবে জলের মধ্যে শতকরা প্রায় 47 ভাগ অক্সিজেন আছে।

1778 খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী এবং জার্মান বংশজাত সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলি আলাদা আলাদা ভাবে একক প্রচেষ্টায় অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। উভয় বিজ্ঞানীই বাতাসে এই গ্যাসটির সন্ধান পান। প্রিস্টলী ও শীলি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করলেও এর সঠিক পরিচয় ওঁদের কেউই দিয়ে যেতে পারেন নি। গ্যাসটির যথার্থ পরিচয় দেন ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে। 'অক্সিজেন' নামটিও তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। 'অক্সিজেন' শব্দটির অর্থ 'অ্যাসিড উৎপাদক'। ল্যাভয়সিয়ের ধারণা ছিল যে, সব অ্যাসিডের মধ্যেই অক্সিজেন বর্তমান। তিনি কিন্তু ভুল ধারণা করেছিলেন।

অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। অম্লতার সঙ্গে অক্সিজেনের কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক ল্যাভয়সিয়ে প্রমাণ করেন যে অক্সিজেনের সংযোগে সালফার, কার্বন, ফসফরাস প্রভৃতি অধাতুগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যে সব অক্সাইড যৌগ গঠন করে, সেই সব অক্সাইড যৌগ আবার পৃথক পৃথক ভাবে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাসিড উৎপাদন করে। —এ দিক থেকে বিচার করলে অক্সিজেনের 'অ্যাসিড উৎপাদক' নামটি হয়তো সার্থক, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা হয় না। তাই অক্সিজেনের 'অ্যাসিড উৎপাদক' নামটির কোন যৌক্তিকতা নেই। তবুও ল্যাভয়সিয়ের দেওয়া 'অক্সিজেন' নামটি রয়েই গেল।

অক্সিজেন একটি মৌলিক গ্যাস। এর প্রতীক বা চিহ্ন হলো O, আণবিক সংকেত O_2. একটি অক্সিজেন অণুতে দুটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 16 এবং পরমাণু ক্রমাংক 8 (আট)। মৌলের পর্যায় সারণীর VI B শ্রেণীতে এর অবস্থান। অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক আছে। সমস্থানিকগুলিকে যথাক্রমে $_8O^{16}$, $_8O^{17}$ এবং $_8O^{18}$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনটি সমস্থানিকেরই পরমাণু-ক্রমাংক 8 (আট) কিন্তু ভর সংখ্যা যথাক্রমে 16, 17, এবং 18।

অক্সিজেন-সমৃদ্ধ কোন যৌগ, জল এবং বায়ু থেকে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়। মারকিউরিক অক্সাইড (HgO), লেড ডাই অক্সাইড (PbO_2) এবং রেড লেড (Pb_3O_4) প্রভৃতি ধাতব অক্সাইডগুলিকে উত্তপ্ত করলে তাদের থেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। যেমন ঃ—

$2HgO = 2Hg + O_2$

$2PbO_2 = 2PbO + O_2$

$2Pb_3O_4 = 6PbO + O_2$

আবার অনেক অক্সিজেন বহুল লবণকে উত্তাপ দিলেও তাদের থেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। যেমন ঃ—

$2KNO_3 = 2KNO_2 + O_2$

(পটাসিয়াম নাইট্রেট)

$2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 4NO_2 + O_2$

(লেড নাইট্রেট)

$2KMnO_4 = K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

(পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট)

$4K_2Cr_2O_7 = 4K_2CrO_4 + 2Cr_2O_3 + 3O_2$

(পটাসিয়াম-ডাইক্রোমেট)

রসায়নাগারে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করতে হ'লে দরকার দু'টি রাসায়নিক দ্রব্য। একটির নাম পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$), অপরটির নাম ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2)। বিচূর্ণ পটাসিয়াম ক্লোরেট চার ভাগ এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড এক ভাগ ভালভাবে মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে একটি পরীক্ষা নলে নিয়ে ধীরে ধীরে গরম করলে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি বোঝানো হয় যে সমীকরণ দিয়ে, সেটি এই রকম ঃ

$$2KClO_3 + [MnO_2] = 2KCl + 3O_2\uparrow + [MnO_2]$$

এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ধনাত্মক অনুঘটক রূপে কাজ করে। তার মানে এই বিক্রিয়ায় MnO_2 নিজে অপরিবর্তিত থেকে পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিয়োজনকে ত্বরান্বিত করে। MnO_2 না মিশিয়ে পটাসিয়াম ক্লোরেটকে 610 ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে তার থেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। কিন্তু

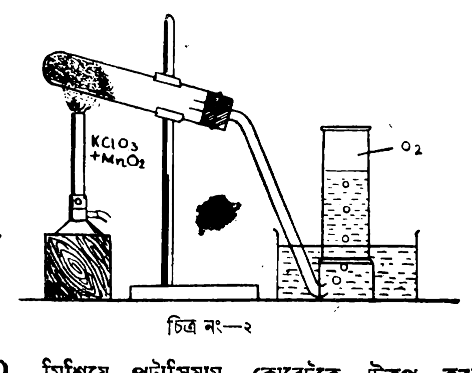

চিত্র নং—২

MnO_2 মিশিয়ে পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে, মাত্র 380 ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতাতেই অক্সিজেন গ্যাস

নির্গত হয়। নির্গত অক্সিজেন গ্যাস নির্গম নল বেয়ে বেরিয়ে আসে। জলের নিম্নাপসারণ দ্বারা গ্যাসটিকে গ্যাস জারে সংগ্রহ করা হয়।

বই পড়ে রসায়ন বিজ্ঞান যতটুকু শেখা যায়, তার থেকে ঢের ভালভাবে শেখা যায় হাতে-কলমে পরীক্ষা করলে। কাজেই স্কুলের পরীক্ষাগারে তোমরা হাতে-কলমে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত ক'রে তার ধর্মগুলি পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ক'রে নিতে পার। যদি তা পার, তাহলে শেখাটা হবে খুব ভাল। মনে থাকবে চিরকাল।

তবে হ্যাঁ, অক্সিজেন তৈরির ঐ পরীক্ষাটি করবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যবহার করতে হবে। ওতে কার্বনের গুঁড়ো অবিশুদ্ধ থাকলে পরীক্ষার সময় তাপ দিলেই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা নলের মিশ্রণটিকে ধীরে ধীরে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে উত্তপ্ত করতে হবে। তা না করলে, মিশ্রণের সমগ্র অংশ থেকে অক্সিজেন গ্যাস বেরুবে না। তৃতীয়তঃ পরীক্ষা নলটিকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধনীর সাহায্যে এমন ভাবে আটকাতে হবে, যাতে ক'রে নলের খোলা মুখটি ঈষৎ নিম্নাভিমুখী থাকে।—এ ব্যবস্থা না করলে মিশ্রণটি নির্গম নলের মুখ বন্ধ ক'রে দিতে পারে এবং তার ফলে পরীক্ষা নল গ্যাসের চাপে ফেটে যেতে পারে। চতুর্থতঃ গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হ'লে নির্গম নলের মুখটি গ্যাস দ্রোণীর জলের উপরে তুলে রাখতে হবে। তা না করলে, দ্রোণী থেকে জল উত্তপ্ত পরীক্ষা নলে ঢুকে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে। —হাতে কলমে পরীক্ষা করার সময় এই সতর্কতাগুলির কথা মনে রেখো কিন্তু।

এই পরীক্ষায় ঝঞ্ঝাট অনেক। বিনা ঝঞ্ঝাটে এবং বিনা তাপে রসায়নাগারে আর এক উপায়ে সহজেই অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করা যায়। কি ভাবে, তা বলি।

বিন্দুপাতী ফানেল ও নির্গম নলযুক্ত একটি শঙ্কু কুপী (Conical flask) নাও। বিন্দুপাতী ফানেলে নাও জল, আর শঙ্কু কুপীতে নাও সোডিয়াম পার অক্সাইড (Na_2O_2)। এরপর বিন্দুপাতী ফানেল থেকে শঙ্কু কুপীর সোডিয়াম পার অক্সাইডের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে জল ফেলতে থাক। সোডিয়াম পার অক্সাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় সাধারণ উষ্ণতাতেই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে। সমীকরণটি হবে এই রকম ঃ

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2 \uparrow$$

বিক্রিয়ার পরে শঙ্কু কুপীতে পড়ে থাকবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)। অক্সিজেন গ্যাস নির্গত নল বেয়ে জলের নিম্নাপসারণ দ্বারা গ্যাস-জারে সংগৃহীত হবে।

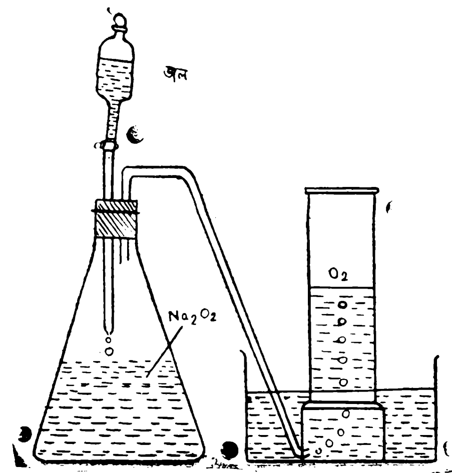

চিত্র নং—৩

বেশী পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদন করতে হলে রসায়নাগারের পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। সাধারণত বায়ু থেকেই অক্সিজেনের পণ্যোৎপাদন বা বাণিজ্যিক উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে বায়ুকে কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসীয় অপদ্রব্য থেকে মুক্ত করে নিতে হয়। বিশুদ্ধ বায়ুকে তারপর উচ্চচাপে পিষ্ট ক'রে সরু ছিদ্রপথে বেরিয়ে যেতে দিয়ে আকস্মিক চাপ মুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়া দুই পর্যায়ে পরপর ঘটানোর ফলে বায়ু শেষ পর্যন্ত এতো শীতল হয় যে, তার উষ্ণতা —200°C এ নেমে আসে। তখন গ্যাসীয় বায়ু পায় তরল রূপ। তরল বায়ুর প্রধান দুটি উপাদান —তরল অক্সিজেন ও তরল নাইট্রোজেন। তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাংক —195°C এবং তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাংক —183°C। সুতরাং—200°C উষ্ণতার তরল বায়ুকে আংশিকভাবে বাষ্পায়িত করলে প্রথমে অধিক উদ্বায়ী তরল নাইট্রোজেন বাষ্পে পরিণত হয়। আর অক্সিজেন অতি শীতল পাত্রে তরল অবস্থায় পড়ে থাকে। তরল অক্সিজেনকে শক্ত ধাতব সিলিণ্ডারে ভরে রাখা হয়। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তরল অক্সিজেন থেকে গ্যাসীয় অক্সিজেন পাওয়া যায়। এটা অক্সিজেনের পণ্যোৎপাদন।

রসায়নাগারে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হলে পর অনেকগুলি গ্যাস-জারে ঐ গ্যাস ভর্তি করে গ্যাস-জারের মুখ কাচের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ। তারপর ঐ গ্যাস নিয়ে

অক্সিজেনের ধর্মগুলি নির্ধারণের পরীক্ষা কর একে একে। দেখবে যে, অক্সিজেন গ্যাসের কোন রং নেই, গন্ধ নেই, স্বাদও নেই। বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী এই গ্যাস। জলে অক্সিজেন সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়।

অক্সিজেন গ্যাস ভরা একটি গ্যাস-জারে একটি শিখা-হীন পাটকাঠি প্রবেশ করাও। দেখবে যে পাটকাঠি দপ করে জ্বলে উঠলো। গ্যাসটি কিন্তু জ্বললো না। বল দেখি —এর থেকে তোমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পার ?—হ্যাঁ, অক্সিজেন গ্যাস নিজে দাহ্য নয় কিন্তু দহনের সহায়ক। আর একটা পরীক্ষা তোমরা করতে পার সংগৃহীত অক্সিজেন নিয়ে।

উজ্জ্বলন চামচে এক টুকরো কার্বন (কাঠ কয়লা) নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করে সেই গরম কার্বন সহ চামচটি অক্সিজেন পূর্ণ একটি গ্যাস-জারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। দেখবে যে, কার্বন ঐ গ্যাসজারের মধ্যে উজ্জ্বল শিখা সহ জ্বলছে।

শিখা নিভে গেলে পর উজ্জ্বলন চামচটি বাইরে বের ক'রে আন। তারপর গ্যাসজারের মধ্যে একটু জল ঢেলে ঝাঁকাও। সেই জলে নীল লিটমাস কাগজ ফেল। দেখবে যে, নীল লিটমাস কাগজ লাল হ'য়ে গেছে। তার মানে, গ্যাস-জারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অ্যাসিড ধর্মী পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া গ্যাস-জারের মধ্যে জল না ঢেলে স্বচ্ছ চুন-জল ঢাল। অমনি গ্যাস-জারের মধ্যে স্বচ্ছ চুন-জল ঘোলা হয়ে যাবে। কিন্তু কেন এমন সব ঘটনা ঘটবে, তা বলতে পার কি? —শোন তবে।

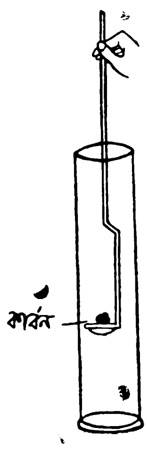

চিত্র নং—৪

অক্সিজেনে কার্বনের দহনের ফলে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। $C + O_2 = CO_2$ জলে ঐ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত হ'য়ে তৈরি করে কার্বনিক অ্যাসিড। $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$ (কার্বনিক অ্যাসিড)। এই অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্যেই নীল লিটমাস কাগজ লাল হয়। আবার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস স্বচ্ছ চুন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে জলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট (সাদা রঙের চূর্ণ পদার্থ) ও জল উৎপন্ন করে। $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$. জলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) জন্যেই স্বচ্ছ চুন-জলকে ঘোলা দেখায়।

উজ্জ্বলন চামচে কার্বনের বদলে যথাক্রমে সালফার, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি মৌল একে একে নিয়ে উপরে বর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করলে গ্যাস-জারের মধ্যে যথাক্রমে উৎপন্ন হবে সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস, ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং সোডিয়াম মনোক্সাইড (Na_2O)। এই সব বিক্রিয়ার সমীকরণগুলি এই রকম ঃ

$$S + O_2 = SO_2$$
$$4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$
$$2Mg + O_2 = 2MgO$$
$$4Na + O_2 = 2Na_2O$$

হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনে নীলাভ শিখাসহ জ্বলে জল উৎপন্ন করে। $2H_2 + O_2 = 2H_2O$. এ পরীক্ষাটা করা অবশ্য তেমন সহজ হবে না তোমাদের পক্ষে। তবে হ্যাঁ, আর একটা সহজ অথচ মজার পরীক্ষা করতে পার তোমরা। বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসকে (NO) অক্সিজেন পূর্ণ গ্যাস-জারের সংস্পর্শে এনে দেখতে পার কি হয়। দেখবে যে, বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই বাদামী রঙের নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড গ্যাস (NO_2) উৎপন্ন করে। $2NO + O_2 = 2NO_2$.

একটুখানি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) মেশানো বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) এর দ্রবণ তৈরি ক'রে তার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস পরিচালনা করো দেখবে যে, বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ অক্সিজেন দ্বারা জারিত হ'য়ে হলুদ রঙের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে পরিণত হয়েছে। বিক্রিয়ার সমীকরণটি এই রকম ঃ

$$4FeCl_2 + 4HCl + O_2 = 4FeCl_3 + 2H_2O$$

এমনিভাবে অক্সিজেনের ধর্মগুলি পরীক্ষার সাহায্যে তোমরা যাচাই করে নাও।

আর কয়েকটি কথা বলে জীবনদায়ী গ্যাসের কথা শেষ করব।

জীবনদায়ী গ্যাস অক্সিজেন শোষিত হয় ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ দ্বারা। অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণও অক্সিজেন গ্যাসকে শোষণ করতে পারে। ওজোন (O_3) গ্যাসের নাম শুনেছ তো ? ওজোন গ্যাস হলো অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। একটি অক্সিজেন অণুতে 2টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে এবং একটি ওজোন

অণুতে 3টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। অক্সিজেন ও ওজোন অণুর মধ্যে অক্সিজেন পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংযুক্ত থাকায় এই রূপভেদের সৃষ্টি হয় এবং অক্সিজেন ও ওজোনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য দেখা যায়।

পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে

বায়ুর প্রধান উপাদান : অক্সিজেন গ্যাস

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1) অক্সিজেন গ্যাস কে কবে আবিষ্কার করেন?

2) 'অক্সিজেন' নাম দেন কোন্ বিজ্ঞানী? 'অক্সিজেন' শব্দের অর্থ কি?

3) অক্সিজেন গ্যাসকে কি ভাবে সাধারণ উষ্ণতায় প্রস্তুত করা যায়?

4) পরীক্ষাগারে 'পটাসিয়াম ক্লোরেট' থেকে অক্সিজেন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে MnO_2 এর ভূমিকা কি?

5) এমন চারটি যৌগের নাম লেখ, যারা উত্তাপে বিযোজিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

6) কি ভাবে অক্সিজেন গ্যাসের পণ্যোৎপাদন করা হয়?

7) অক্সিজেনের রূপভেদ ও সমস্থানিকগুলির পরিচয় দাও।

8) অক্সিজেন গ্যাসে কার্বনকে দহন করে দহনজাত পদার্থে জল মেশালে কি উৎপন্ন হয়? সমীকরণ সহযোগে বোঝাও।

9) 'অক্সিজেন গ্যাসের জারণধর্ম আছে'—এই সত্য প্রমাণের জন্যে একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর।

10) অক্সিজেন গ্যাস শোষিত হয় কিসে?

11) অক্সিজেন গ্যাসকে কি ভাবে সনাক্ত করা যায়?

12) অক্সিজেন গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলি লেখ।

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য
ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-এর সেরা বই
ডঃ অলক চক্রবর্তী, ডি. এস. সি.
ও
অমিয়তোষ রায় লিখিত
বিজ্ঞান প্রবেশিকা
তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ
[সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক অংশ সহ]
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪৩১৫৭ * গ্রাম : গ্রন্থাগার

পৃথিবীর এক দ্রুততম সাপ

অমৃত গুপ্ত

কয়েক বছর আগে গ্রামবাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে ঝিমধরা দুপুরে একটা আমগাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিছুদিন ধরে একটানা খরা চলছে। হাওয়াও কোথাও যেন নিরুদ্দেশ। এখানে সেখানে ক্লান্ত পাখিদের আনাগোনা। তাদের ডাক মাঝে মাঝে কানে আসছে, চিক্ চিক্, ক্যাঁক ক্যাঁক বা ঘুগ ঘু ঘুগ ঘু। অদূরে শিমূল গাছটার একেবারে মগডালের উপর থেকে এক বাহারী পাখি পুরুষ বসন্ত বৈরীর একটানা ডাক—তগ্রুক! তগ্রুক! তগ্রুক। পাখিটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছি, হঠাৎই সব শব্দকে ছাপিয়ে কানে এলো অস্ফুট আওয়াজ—কোঁয়াক কোঁয়াক! শব্দটা আসছে আমার থেকে কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে পুঁইশাকের খেতের আলের ধার থেকে। এ আওয়াজ আমার অত্যন্ত পরিচিত। কোনো ব্যাঙ্ সাপের শিকার হয়েছে! নিজের অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করতে সন্তর্পণে গুটি গুটি পায়ে আলের উপর দিয়ে যাচ্ছি নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। জায়গাটার হাত পাঁচেক কাছে এসে দেখি একটা বড়সড় সাপ মাথাটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ভাব শিকার ধরা। সাপটি হয়ত আমাকে আগেই দেখে ফেলেছিল। চোখাচোখি হতে না হতেই মাটি থেকে মাথাটি বিঘৎখানেক তুলে শিকারটা নিয়ে অতিদ্রুত গতিতে হাত পঞ্চাশেক দূরে বাঁশঝাড়টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ময় জাগে সাপটির তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা দেখে।

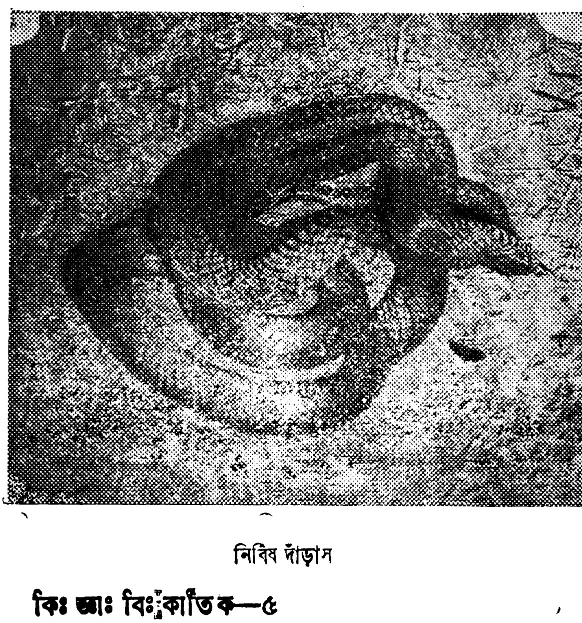

নির্বিষ দাঁড়াস

সাপটা লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। উজ্জ্বল ফিকে হলুদ রঙের. মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত শরীরের নিচে সরু কালো অর্দ্ধচক্রাকার বেড় দু আঙ্গুলের মতো দূরত্ব রেখে চলে গেছে। পিঠে পরিস্কার দেখা যায় হাল্কা ত্রিকোণ ছোট আঁশ একটার সঙ্গে আরেকটা ঠাসাঠাসি করে আছে। চোয়ালের তলায় তীর চিহ্নর মতো কালো দাগ। সাপটার নাম দাঁড়াস, ইংরাজি নাম র‍্যাট স্নেক। টীয়াস (Ptyas) গণের একমাত্র প্রজাতি। বৈজ্ঞানিক নাম টীয়াস মিউকিউসাস্। সম্পূর্ণ নির্বিষ সাপ দাঁড়াস।

এই সাপটির সঙ্গে বিষাক্ত গোখরোর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দাঁড়াস গোখরোর চেয়ে লম্বা এবং তার মাথাটি গোলাকার। আরেকটা পার্থক্য আছে এদের সমস্ত শরীরটা ছিপছিপে। যার ফলে বাতাসের গতিকে এরা অনায়াসে কাটিয়ে তড়িৎ বেগে চলাফেরা করতে পারে। পূর্ণবয়স্ক গোখরো এদের তুলনায় একটু স্থূলকায় এবং গতি মন্থর।

ভারতের সর্বত্র এই সাপটিকে দেখা যায়। এমনকি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এদের বিস্তৃতি। ভারতে সমতল ভূমি থেকে নিয়ে হিমালয়ের বার হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বিচরণ ভূমি। সমতলভূমিতে পর্ববর্ণিত রঙ ছাড়া হাল্কা বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয়ে থাকে। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলে এই সাপের রঙ একেবারে মিশমিশে কালো। তার উপর হাল্কা বা গাঢ় সবুজ বা বাদামী ছিট্ ছিট্ দাগ।

দাঁড়াসের সব থেকে প্রিয় খাদ্য ইঁদুর, তাই ইংরাজি নাম র‍্যাট্ স্নেক। ইঁদুর যেখানে সেখানেই দাঁড়াস, আবার মানুষ যেখানে সেখানেই ইঁদুর। অতএব, মানুষ বসতির (গ্রামাঞ্চলে) আশে পাশে দিনের বেলায় এই সাপটি বেশি করে দেখা যায়। দিনের বেলায় এরা সব চাইতে সক্রিয়। শস্যক্ষেত থেকে গিয়ে মানুষের হেঁসেল পর্যন্ত এদের আনাগোনা ঐ ইঁদুরের সন্ধানে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কৃষিক্ষেতে সব চাইতে খাদ্য অনিষ্টকারী জীব হলো ইঁদুর। নিজের চাহিদার তুলনায় ফসল নষ্ট করে বেশি। সুতরাং, প্রকৃতির এই ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব এই সাপটিরই অধিক। এদের কৃষি বন্ধু আখ্যা দিলেও কোনো অত্যুক্তি হবে না। ইঁদুর মারার জন্য কত রকম যন্ত্র ও দামী দামী ঔষধ তৈরী হচ্ছে কিন্তু সঠিক সমাধান এখনও মানুষ করে

উঠতে পারেনি। আবার এও প্রমাণিত মানুষ যদি সমূলে এই ইঁদুর নামক প্রাণীটির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করতে পারে তবে দেখা দেবে প্রকৃতির ভারসাম্যের আরেক সমস্যা। একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে সব শসাখেতে ইঁদুরের বেশি উপদ্রব সেখানে কিছু সংখ্যক দাঁড়াস সাপ ছেড়ে দিয়ে ফলাফলটা কী হয় দেখা। ইঁদুর এদের প্রিয় খাদ্য বলেও ব্যাঙ, গিরগিটি, ছোট পাখি এমন কী ছোট সাপও এদের নিয়মিত খাদ্য। শিশু দাঁড়াস প্রথম বছরটা শুধু মাত্র ব্যাঙের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু পরে ছোট বা বড় ইঁদুর শিকার ও খেতে পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠে। শিকার জ্যান্ত কিম্বা মরা অবস্থায় গিলে চোয়াল ও শরীরের চাপে পিষে খায়।

অত্যন্ত গুণ-সম্পন্ন এই পাহীন সরীসৃপটি যে কোন জায়গায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকতে পারে। পিঁপড়ের ঢিবি, ইঁদুরের গর্ত বা ইঁট-পাথরের স্তূপের মধ্যে বেশির ভাগ সময় বসবাস করে। ঝোপঝাড়, ধানের ক্ষেত এবং খাদ্যদ্রব্য যেখানে মজুত থাকে সেখানে এদেরকে দেখা যায় শিকারের সন্ধানে। মানুষ বসতির কাছে থাকে বলে মানুষের হালচাল এদের জানা হয়ে যায়। যতটা সম্ভব মানুষকে এরা এড়িয়ে চলে। বাধ্য বা উত্তেজিত হয়ে কখনো কামড়ালে দংশন স্থানটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিষ হওয়ায় বিপদের কোনো আশংকা নেই। ভয়ে উত্তেজিত হলে একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ করে।

স্ত্রী দাঁড়াস আট থেকে নিয়ে ষোলটা পর্যন্ত ডিম দেয় মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে। কখনো সখনো শীতেও ডিম পাড়তে দেখা যায়। ডিম পাড়ার পর পঞ্চাশ ষাট দিন সময় লাগে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে। এই সাপটির সংখ্যা বহুলাংশে কমের দিকে। ইদানীং গ্রামের দিকেও খুব একটা এই সাপ দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সাপ মানুষের শিকার হতো এর অতি সুন্দর চামড়ার জন্য। কোনো অঞ্চলের অধি-বাসীরা এর চামড়া বিক্রি করার পেশায় নিযুক্ত ছিল। এদের সুস্বাদু মাংস কোনো কোনো অধিবাসী খায়। ভারত সরকার এর ভয়াবহ হ্রাসের দিকটার কথা ভেবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বলে এই সাপ হত্যা বা এর চামড়া বিক্রি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছেন।

২৪৯, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ভাবনা • ফটোমাইক্রোগ্রাফি

অনির্বাণ চক্রবর্তী

আলোকচিত্র শিল্পের যে শাখায় অণুবীক্ষণের সাহায্যে আলোকচিত্র বা ফটো প্রস্তুত করা হয় তাকে ফটোমাইক্রো-গ্রাফি (Photomicrogarphy) বা আলোক অণুবীক্ষণিক চিত্র শিল্প বলা হয়। রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূগোল এবং ভেষজ বিদ্যায় ফটোমাইক্রোগ্রাফির গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ আছে। ফটোমাইক্রোগ্রাফির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌগিক অণুবীক্ষণ ব্যবহার করা হয়। এই অণুবীক্ষণের অভিনেত্রের বিপরীতে একটি ক্যামেরা এমনভাবে বসানো থাকে যাতে একটি ঝিল্লী অথবা পাতের উপর প্রতিবিম্বকে ফোকাসিত করা যায়। বিশদভাবে ফটো তোলার কাজে যৌগিক অণুবীক্ষণের পরিবর্তে ইলেকট্রন্ অণুবীক্ষণ ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞানে ফটোগ্রাফি ব্যবহারের সুবিধা হল এই যে, এর সাহায্যে দৃশ্যমান প্রতিবিম্বের সাদা কালোয় অথবা রঙিন অভিলেখ প্রস্তুত করা যায়। এভাবে পাওয়া স্থায়ী অভিলেখ নিয়ে অবসর সময়ে মূল বস্তুর অবর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার কাজ চালানো যায়। অতিরিক্ত অনুজ্জ্বল অথবা অতি ক্ষুদ্র যেসব বস্তু খালিচোখে দেখা যায় না সেগুলির আলোক চিত্র ফটোমাইক্রোগ্রাফির সাহায্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ফটোমাইক্রো-গ্রাফি আমাদের দৃষ্টির সীমাকে প্রসারিত করেছে। যদিও সাধারণতঃ কার্বন আর্ক বাতি এবং দীপ্ত টাঙ্গস্টেন তারের বাতিগুলি আলোর উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঝলককুণ্ড (flash·bulb), ইলেকট্রনিক মোক্ষণ বাতিগুলি এবং সোডিয়াম বাতিও আলোক উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণ-রঞ্জিত করে এবং যে সমস্ত বর্ণ রঞ্জেনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির পরিপূরক বর্ণের আলোকে যেতে দেয় এরকম ফিল্টার ব্যবহার করে প্রাপ্ত চিত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তারতম্যকে প্রকাশ করা যায়।

লক্ষ্যবস্তুর অংশগুলি সবচেয়ে বিশদভাবে চিত্রে উপস্থাপিত করার জন্য অতি-বেগুনী আলো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু অতিবেগুনী আলোক সাপেক্ষে অস্বচ্ছ সেসব ক্ষেত্রে বৃহত্তর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অব-লোহিত আলো ব্যবহৃত হয়।

ধাতুচিত্রবিদ্যা (Metallography) প্রভৃতি বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখায় রঙিন ফটোগ্রাফি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে আলোক সম্পাতের সময় এবং ফিল্টার বাছাইয়ের ব্যাপারে সতর্কতার প্রয়োজন হয়৹।

অলক্ষ্যে যারা অবলুপ্ত হতে চলেছে

ধীরেন দত্ত

আমাদের জাহাজ আজ দুদিন ধরে বার-সমুদ্রে নোঙর করা রয়েছে। সামনে বন্দর-নগরী ফ্লোরিডা। দিন দুই আগে বন্দরে কি নিয়ে যেন একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হয়েছে, তাই কোনো জাহাজকে বন্দরে ঢুকতে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের অলস দিন আর রাতগুলো কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছিল।

সেদিন দুপুরে কেবিনে শুয়ে তিনবার-পড়া উপন্যাসটায় মন বসানোর চেষ্টা করছি, এমন সময় বাইরে ডেকের ওপর একটা হৈ চৈ শুনতে পেলাম। আমি বই হাতে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনের নাবিকটার কাছে ঘটনাটা কি জানতে চাইলে, সে মুখ দিয়ে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করে বলল, এমন জিনিসটা লুট হয়ে যাচ্ছে! আফশোসে মরে যাই!

সকলের মত আমিও রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়লাম। অনতিদূরে সাগরের জলে তখন এক বিভৎস হত্যাকাণ্ড চলছে। প্রকাণ্ড একটা সামুদ্রিক প্রাণী চিৎ হয়ে সাগরের জলে ভাসছে, তার ধবধবে সাদা তলপেটে রদ্দুর পড়ে চক্ চক্ করছিল। অসংখ্য হাঙর ওর চারপাশে এসে জুটেছে। রাক্ষসগুলো প্রাণীটার শরীর থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে, সাগরের নীল জল লাল হয়ে উঠেছে। তখনও প্রাণীটার বুকের পাখনা তুর তুর করে কাঁপছিল। একজন নাবিককে প্রাণীটার নাম জিজ্ঞাসা করায়, সে বলল, 'ম্যানাটি দেখেন নি! ম্যানাটি! পৃথিবীর সেরা মাংস যার'। ম্যানাটির নাম শুনেছিলাম, আজ স্বচক্ষে এই অসহায় প্রাণীটাকে দেখলাম।

সাইরেনিয়া (Sirenia) গোষ্ঠীর তিনটি প্রাণী। স্টেলার্স সী কাউ (Steller's Sea cow), ম্যানাটি (Manatee) এবং ডুগং (Dugong)। অতীত কালে ইউরোপীয় পালতোলা জাহাজগুলো যখন আফরিকা বা আমেরিকার উপকূল ধরে যেতো, তখন দূর থেকে সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর প্রাণীদের সমুদ্রতটে শুয়ে থাকতে দেখে, নাবিকরা মনে করত, জলপরীরা সাগর-তীরে বিশ্রাম করছে। বাচ্চা কোলে এই প্রাণীদের দূর থেকে দেখে মনে হত, ওরা যেন শিশুদের দুধ খাওয়াচ্ছে। এই থেকে পুরাতন সাহিত্যে জলপরীদের নিয়ে নানা গল্পগাঁথা রচিত হয়েছে।

মানুষের নৃশংসতার জন্য যে সমস্ত প্রাণী পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর স্টেলার্স সী কাউ (Steller's Sea cow) তাদের মধ্যে একটি। এক সময়ে উত্তর আমেরিকার হিম-শীতল সাগরে এই প্রাণীটা হাজারে হাজারে বিচরণ করত। বেরিং সাগর, এলেসমিফর দ্বীপপুঞ্জের চারপাশের সমুদ্রে, বাফিন, উপসাগরে ওরা প্রচুর সংখ্যায় ঘুরে বেড়াত। ওরা ছিল লম্বায় ৬৫২ সেন্টিমিটার আর ওজনে প্রায় চার হাজার কিলোগ্রামের মত। এই প্রাণীটা ছিল তৃণভোজী, কেবল মাত্র সমুদ্রের ঘাস, গুল্ম এবং শ্যাওলা খেয়েই ওরা জীবন ধারণ করত। অত্যন্ত নিরীহ এই প্রাণীটা কখনই মানুষকে বা জলের অন্য প্রাণীদের আঘাত করত না।

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে সাদা সাদা মানুষেরা দলে দলে এই নূতন মহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তারা সেই সুদূর মেরু-সমুদ্রে পর্যন্ত হামলা করল। ওরা হারপুন ছুড়ে, রাইফেলের গুলিতে আর জালে আটক করে লক্ষ লক্ষ সী-কাউ নিধন করতে লাগল এবং মাংস, চর্বি এবং ব্লাবার (চামড়ার নিচের চর্বির আস্তরণ) জাহাজ ভর্তি করে ইউরোপে চালান দিতে লাগল। সেই নৃশংস আক্রমণের মুখে সাগরের এই নিরীহ প্রাণীটা বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারল না। ১৯৪২ সালে শেষ প্রাণীটা নিহত হবার পর মেরু সমুদ্রে এদের একটাকেও আর কেউ দেখেনি।

সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর অপর হচ্ছে ম্যানাটি (Manatee)।

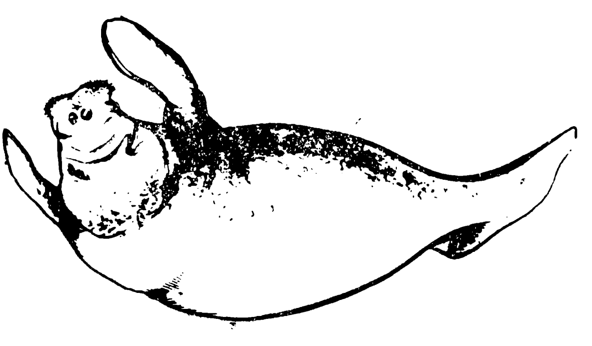

ওরা আবার তিনটে প্রজাতিতে বিভক্ত। ট্রাইকেশাশ্ ম্যানাটাস্রা আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব সমুদ্রতীর এবং ভেরা-ক্রুজ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত অগভীর সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করে। এদের অন্য প্রজাতিটি ট্রাইকেশাশ ইনান্গুইস আমাজানের মোহনা থেকে ওরিনোকো এলাকা পর্যন্ত ঘোলাজলের সমুদ্রোপকূলে ঘুরে বেড়ায়। আর একটা প্রজাতি ট্রাইকেশাশ সেনেগালেনসিস্দের বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে সেনেগাল নদীর মোহনা থেকে কুয়ানান্স নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সাগরের জলে। স্রোতহীন অগভীর সমুদ্র এবং নদীর মোহনার ঘোলা জলই ম্যানাটিদের পছন্দ করা এলাকা।

সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর সব প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। ম্যানাটিরা নোঙরকরা মোটর বোটের চারপাশে ঘুর ঘুর করে, আর মধ্যে মধ্যে জলযানের গায়ে মুখ লাগিয়ে লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। একবার জর্জ টাউনের একটা মাছধরা জাহাজের প্রপেলারে ধাক্কা খেয়ে একটা ম্যানাটি দারুণ আহত হয়েছিল এবং পরে মারা পড়েছিল! সাধারণত ওরা একা একা চরতে অভ্যস্ত, কেবলমাত্র বাচ্চারা মায়ের সাথে সাথে ফেরে। তবে দারুণ শীতের সময় সাগরের উষ্ণস্রোত এলাকায় নানা দিক থেকে ম্যানাটিরা এক জায়গায় এসে জড়ো হয়। সেই সময় গরম স্রোতে গা ভাসিয়ে এক একটা দলে পনেরো কুড়িটা একসাথে ঘুরে বেড়ায়, আর মানুষের কাছে ওটাই মওকা। জলে বন্দী করে পাঁচ দশটাকে এক একবারে ধরা যায়।

সাধারণতঃ দশ পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ম্যানাটিরা জলের ওপর মুখ তুলে দম নেয়, তবে বিপদ বুঝলে বা ভয় পেলে ওরা বহু সময় ধরে সাগরের তলে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। ফ্লোরিডার চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় একটা ম্যানাটি নানারকম খেলা দেখাতে শিখেছিল। জর্জ টাউন আর একটা বন্দী ম্যানাটি দর্শকদের হাত থেকে ঘাসের গুচ্ছ কেড়ে নিয়ে সকলকে আনন্দ দিত। বৃটিশ-গায়নায় ওদের বন্দরে ও সমুদ্রের খাঁড়িতে জলজ-ঘাস এলজি মুক্ত রাখার কাজে ব্যবহারক রা হচ্ছে।

সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর সব প্রাণীদের মত ম্যানাটিরা তৃণভোজী। ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে ওদের পাকস্থলীতে তৃণজাতীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছুই নেই। উপসাগরে বা নদীর মোহনার তলদেশে সামুদ্রিক ঘাস, গুল্ম বা এ্যলজি প্রধানতঃ ওদের খাদ্য, তবে অনেক সময় ডাঙ্গার গাছপালা যা সমুদ্রের জল ছুঁই ছুঁই করে ঝুলে থাকে, তাদেরও টেনে টেনে ওরা খায়। ভাসমান সামুদ্রিক শ্যাওলা বা কচুরীপানা খেয়েও সারা করতে ওরা ওস্তাদ। একটা ৪.৫ মিটার লম্বা ম্যানাটি ২৭ থেকে ৪৫ কিলোগ্রাম খাদ্য একদিনে হজম করে ফেলতে পারে।

এই প্রাণীটা সাধারণতঃ একটা সন্তান প্রসব করে। তবে কদাচিৎ একজোড়া বাচ্চা হতেও দেখা যায়। সন্তান প্রসবের সময় মা-ম্যানাটি একেবারে জলের তলায় চলে যায় এবং প্রসবের প্রায় সাথে সাথেই বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে জলের ওপর ভেসে ওঠে। একটা সদ্যজাত সন্তান এক মিটারের মত লম্বা এবং ওজনে কুড়ি কিলোগ্রামের মত হয়ে থাকে। বাচ্চা বয়সে ওদের গায়ের রং ফিকে হলুদ আর বয়েস বাড়ার সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাদামি হতে থাকে। প্রায় বৎসরাধিক কাল বাচ্চারা মায়ের সাথে সাথে ফেরে, তারপর যে যার পথ ধরে।

ড্‌গং হচ্ছে সাইরেনিয়া গোষ্ঠীর অপর একটি প্রাণী। মালয়ে এই প্রাণীটাকে বলা হয় ড্য়ুং, শ্রীলঙ্কার লোকে ওদের বলে মুধুউরা, দক্ষিণ ভারতের তামিলদের কাছে এই প্রাণীটা কাদালপাণ্ডি নামে পরিচিত। আফরিকার পূর্ব-উপকূলে, লোহিত সাগরে বঙ্গোপসাগরে, মালয়, মালাক্কা, ফিলিপাইন হয়ে নিউগিনি এমনকি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের অগভীর সমুদ্রে এই প্রাণীদের দেখা যাবে। উষ্ণ এলাকার সমুদ্রেই ড্‌গংদের বাস।

একটা পূর্ণবয়স্ক ড্‌গং লম্বায় তিন মিটার পর্যন্ত হতে পারে, ওজনে প্রায় ১৭০ কিলোগ্রামের মত। অগভীর সমুদ্রের খাঁড়িতে প্রায়ই ওদের বাদামি রংয়ের পিঠ ভাসিয়ে ঘুরতে দেখা যাবে। লেজের পাখনা খাঁজ কাটা আর বুকের পাশের পুরু চওড়া পাখনা দুটো দিয়ে ওরা স্বচ্ছন্দে জল কেটে কেটে চলে। জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে যখন ওরা দম নেয়, ওদের মুখের খোঁচা খোঁচা লোমযুক্ত গোঁফ পরিষ্কার দেখা যায়। মুখে মুখ ঘসে ওরা একে অপরকে আদর জানায়। ম্যানাটিদের মত ড্‌গংরা একটাই বাচ্চা প্রসব করে, তবে কখনও কখনও একজোড়া বাচ্চাও ওদের হয়। জন্মের পরই মায়েরা বাচ্চাদের বুকের নিচের পাখনা জোড়ার ভেতরে করে আগলিয়ে রাখে।

পৃথিবীর সমস্ত তৃণভোজী প্রাণীরাই মানুষের খাদ্য তালিকার প্রথম স্থান অধিকার করে রেখেছে। সাগর তলের তৃণভোজী সাইরেনীয়দের মাংসও খুব সুস্বাদু, ওদের চর্বি ও রাবার খুব দামে বাজারে বিক্রি হয়। ওদের প্রাকৃতিক শত্রু অর্থাৎ তিমি বা হাঙর ওদের সামান্য ক্ষতি করতে পারে। মানুষের লোভই ওদের প্রধান শত্রু।

মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপের জন্য এই যে প্রাণীকুলের অবলুপ্তি, এটা কি মানুষের নিজেরই বিলুপ্তির ঘণ্টাধ্বনি নয়?

ডাকঘর—সন্দেশখালি, ২৪ পরগণা

বাজ, বিদ্যুৎ, বেঞ্জামিন

রত্না ঘোষ

ধন্য রাজা জর্জ, তুমি জ্ঞান খুঁজে ফের !
রাজরোষে 'সরু' হয় 'ভোঁতা',
জাতির বাঁধন যায় টুটে ।
ফ্র্যাঙ্কলিনের জ্ঞানের পরিধি, ধায় দ্রুততর,
ব্যর্থ হয় রাজার বিরোধী হুঙ্কার,
বাজ নিরোধক থেকে যায় 'সরু'তেই ॥

মেঘের গর্জনের সাথে আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকানি—এক কথায় বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। বিভিন্ন পুরাণে বজ্রপাতকে একটি তীব্র ও ঘনীভূত দৈবশক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়া ঐ দৈবশক্তির ভয়ঙ্কর প্রকাশকে শুভ অশুভ বিভিন্ন সংস্কারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভিন্ন পুরাণে। বজ্রপাতের সংস্কারগত পৌরাণিক ব্যাখ্যা এখানে আলোচ্য নয়। আজকের এই আলোচনায় বজ্রপাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বজ্রপাত নিবারণে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন বজ্রপাত (lightning) ও বিদ্যুৎ (electricity) একই ঘটনা। বজ্রপাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তিনি আবিষ্কার করলেন বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড (Lightning Arrester)। তাঁর এই আবিষ্কারকে ঘিরে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিতে একটি জটিল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। ফ্র্যাঙ্কলিনের বর্ণনায় বাজ-নিরোধক দণ্ডটির অগ্রভাগকে হতে হবে 'সরু'। কতকগুলি রাজনৈতিক কারণবশতঃ ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জ (১৭৩৮-১৮২০) ফ্র্যাঙ্কলিনের মতের বিরোধিতা করে বসলেন। তাঁকে ইন্ধন যোগালেন রয়াল সোসাইটির কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে অগ্রভাগটি হবে নব্ (knob)-যুক্ত বা ভোঁতা। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর পরবর্তীকালে ফ্র্যাঙ্কলিন নির্দেশিত বাজ-নিরোধক দণ্ডটিই স্থায়িত্ব পেয়েছিল—নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে। সেকালের ঐ বিতর্কিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরুর ঐ কবিতাটি লেখা হয়েছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে রাজার বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করে এটি লিখেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিনের কোন এক সহকর্মী।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে জানা যায় যে, রাজা তৃতীয় জর্জ, রাজা হয়েও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয় একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞান প্রচারক স্টিফেন্ দ-মেইনব্রে-র কাছে। এছাড়া দক্ষ যন্ত্রকুশলী জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌কে দিয়ে রাজা বেশ কিছু যন্ত্রপাতিও তৈরি করিয়েছিলেন। বর্তমানে লণ্ডনের 'সায়েন্স মিউজিয়মে' রক্ষিত রাজার ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি সমসাময়িক বিজ্ঞানে তাঁর অপরিমিত উৎসাহের সাক্ষ্য দেয়। রাজারই নির্দেশে ফ্র্যাঙ্কলিন আবিষ্কৃত বজ্রপাত নিরোধক দণ্ডটি বসানো হয়েছিল বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের মাথায়। অথচ আমরা দেখি পরবর্তীকালে 'সরু' এবং 'ভোঁতা' নিয়ে দ্বন্দ্ব চলাকালীন কোন মন্ত্রবলে রাজা তাঁর মতকে উল্টে দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন একজন আমেরিকান এবং বৃটিশ রাজতন্ত্র হঠাতে আমেরিকায় তখন চলেছে আমেরিকান বিপ্লব—কতকটা সেই কারণেই রাজার এই মত পরিবর্তন। ফলস্বরূপ বাকিংহাম প্যালেসের ফ্রাঙ্কলিনের 'সরু' মাথার বজ্রপাত নিরোধকটি পরিবর্তিত হ'ল ভোঁতা মাথায়। রাজনীতির চোরাপথে বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে পড়ল পথভ্রষ্ট।

সেটা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশে তখন বৃটিশ রাজতন্ত্র চলেছে। ইংলণ্ডের রাজা তখন মহামান্য তৃতীয় জর্জ। সরকারী তহবিলের উন্নতিকল্পে আমেরিকান কলোনীগুলিতে Stamp-act চালু করার নির্দেশ দিলেন রাজা। সাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর ওপর বসানো হ'ল অতিরিক্ত কর। আমেরিকান নেটিভরা ঐ কর দিতে অস্বীকার করলেন। জানা যায়, বহুকালের স্বাধীনতা পোষণকারী আমেরিকান নেটিভরা ঐ stamp-act-কে কেন্দ্র করে বৃটিশ রাজ-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ছোটখাট বৈপ্লবিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আমেরিকান নেটিভদের স্বাধীনতার দাবী উঠতে লাগল। শুরু হ'ল আমেরিকান বিপ্লব।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তখন ইংলণ্ডে। ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছেন। রয়াল সোসাইটির সদস্য পদের আমন্ত্রণ পেয়ে ঐ সোসাইটিতে তিনি তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় রত। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-চর্চার পীঠস্থান রয়াল সোসাইটিতে তখন বহু স্বদেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছিল। আমেরিকান নেটিভদের পক্ষ থেকে ফ্রাঙ্কলিন এলেন বৃটিশ পার্লামেন্টে—ট্যাক্স তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানাতে। তাঁর সেই অনুরোধ তখন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, আমরা দেখি, আমেরিকান নাগরিকদের পক্ষ থেকে বৃটিশ রাজ-এর কাছে পাঠানো declaration of independence-এ আরও কয়েকজনের সাথে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন-এর সইও তাতে ছিল। জেফারসন রচিত ঐ declaration of independence-এ স্বাধীনতা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি দাবীও ছিল। সংক্ষেপে এই ছিল অষ্টাদশ শতকের আমেরিকান বিপ্লবে ফ্রাঙ্কলিনের ভূমিকা।

বিপ্লবী ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিচয় তো পাওয়া গেল। এবার জানা যাক বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিনকে। বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের জগতে ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রবেশের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে ৪০ বছর বয়সে ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর নিজস্ব ছাপাখানার ব্যবসায়িক জগত থেকে নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে আনছিলেন। মনে মনে যখন দার্শনিক অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করার কথা চিন্তা করছিলেন, ঠিক তখনই পিটার কলিন্‌সনের লেখা একটা চিঠি তাঁর নজরে পড়ে। সেটা ছিল ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি থেকে ঐ চিঠিটি কলিনসন পাঠিয়েছিলেন ফিলাডেলফিয়ার লিটারারি সোসাইটিতে। চিঠিটির বিষয়বস্তু ছিল বিদ্যুৎ বিষয়ে কিছু পরীক্ষার ফলাফল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ফ্র্যাঙ্কলিনের দ্বিতীয় যোগাযোগটি ঘটে আমেরিকার বোস্টন শহরে। বোস্টনের একটি প্রকাশ্য সমাবেশে জনৈক ডক্টর স্পেন্স বিদ্যুৎ বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা দেখান। সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও ঐ পরীক্ষাগুলি দেখার পর ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ বেড়ে যায়। তিনি ডক্টর স্পেন্স-এর কাছ থেকে ওঁর সব যন্ত্রপাতি কিনে নেন। ইতিমধ্যে নির্দেশ সহ কিছু যন্ত্রপাতি উপহার পেয়ে গেলেন পিটার কলিন্‌সনের কাছ থেকে। ফ্র্যাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এখানেই শুরু। জানা যায়, বোস্টনে ফ্র্যাঙ্কলিনের বাড়ীতে বিজ্ঞানের নতুন বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করতে প্রচুর জনসমাগম হ'ত। অবশেষে ফ্র্যাঙ্কলিনের অনুরোধে প্রতিবেশী মিস্টার কিনারসলি অর্থের বিনিময়ে ঐসব পরীক্ষা প্রদর্শনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

একের পর এক ফ্র্যাঙ্কলিনের পরীক্ষাগুলো সফল হতে থাকে। এ সময় ফ্র্যাঙ্কলিন স্থির করলেন পিটার কলিনসন্‌কে এইসব পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ ফল সম্পর্কে বিশদভাবে জানানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য। শুরু হয়ে গেল পিটার কলিনসন্‌ ও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের মধ্যে বিস্তৃত পত্র-যোগাযোগ।

১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ—এই আট বছর ধরে তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল। ঐসব চিঠি ফ্র্যাঙ্কলিনের স্থির বিদ্যুৎ সম্পর্কিত পরীক্ষার অন্যতম দলিল হয়ে আছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে।

পিটার কলিনসন তখন রয়াল সোসাইটির সদস্য। স্থির বিদ্যুতের নানান মূল্যবান তথ্যে ভরা ফ্র্যাঙ্কলিনের চিঠিগুলি ঐ সোসাইটির সদস্য সভায় নিয়মিত পাঠ করে শোনাতেন তিনি। কিন্তু জানা যায় সোসাইটির বিশেষজ্ঞ মহলে সেগুলি তখন বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়নি। মিস্টার কলিনসন তবুও হাল ছাড়লেন না। জনৈক ডক্টর ফদারগিল-এর পরামর্শে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন মিস্টার কলিন্‌সন। মিস্টার কলিনসন্‌ প্রকাশিত ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ গবেষণা গ্রন্থের নাম ছিল "New Experiments and Observations on Eletricity, made at Philadelphia, in America by Benjamin Franklin" এটিকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করলেন ফরাসী বিজ্ঞানী ডালিবার্ড। জানা যায় ফরাসী রাজপরিবারের দর্শনের শিক্ষক অ্যাবে নোঁলে ঐ ফরাসী অনুবাদটি পড়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ সব পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এ সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ গবেষণা গ্রন্থ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ছাপা হতে থাকে। একে একে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মান ভাষায় ও ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় ভাষায় ঐ বইয়ের অনুবাদ ছাপা হয়। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত বজ্রপাত ও মেঘের বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ফ্র্যাঙ্কলিনের মতবাদের আশু প্রচলন হতে থাকে সমগ্র ইওরোপে। সেই সময় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে বলা হতে লাগল 'Newton of Electricity.'

মেঘে মেঘে ঘর্ষণজনিত আকাশের বিদ্যুৎ ও পরীক্ষাগারের বিদ্যুতের ধর্মগুলির মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছেন তার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই কলিনসনকে জানানো একটি চিঠিতে। তিনি বলেছেন,

> "তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ সোজা নয়, আঁকা-বাঁকা; বজ্রবিদ্যুৎও সেইরকম। সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের বস্তু সহজে তড়িৎ আকর্ষণ করে; বজ্রবিদ্যুৎও আছড়ে পড়ে পাহাড়ের চূড়া, গাছ, মাস্তুল এবং সরু লম্বা চিমনীর ওপর। একাধিক পথে সঞ্চালনের সময় তড়িৎ বেছে নেয় সবচেয়ে সুপরিবাহীকে; বজ্রবিদ্যুতেব ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। তড়িৎ-এর মতন বজ্রবিদ্যুৎও কোন দাহ্য

পদার্থ এবং কোন ধাতব বস্তুকে গলিয়ে দিতে পারে। সুপরিবাহীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে বজ্রবিদ্যুতের ফলে চুম্বকের মেরুদ্বয়ের অবস্থানের পরিবর্তন হয়; তড়িতের ক্ষেত্রেও একই ক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়।”

এখন যে ঘটনাটির কথা বলতে যাচ্ছি সেটি ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক ২৩০ বছর আগে। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ে জাগতিক মানুষের সে এক ভয়ানক দুঃসাহসিক পরীক্ষা। যেন খোদার ওপর খোদকারী!

সেটা ছিল ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস। ঘন দুর্যোগের একটা দিন। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড ঝড়। থেকে থেকে মেঘের গর্জন, সেই সঙ্গে আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। যেন এমনই একটা দিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। কিছুমাত্র দেরী না করে ছেলেকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। ওড়ালেন ঘুড়ি আকাশে। টেনে নামালেন আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বুকে। প্রকৃতির ওপর পড়ল বিজ্ঞানের হাত। ঘটল না কোন অঘটন। খোদার ওপর খোদকারীতে এই প্রথম সফল হলেন পৃথিবীর মানুষ।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই একই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন সেণ্ট পীটার্সবার্গের (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) জনৈক জর্জ রিখ্‌মান এবং ব্যর্থতার মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল বিদ্যুতাবেশে তাঁর মৃত্যুতে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে।

বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের এই সফল পরীক্ষার বিশদ বিবরণ পাওয়া গেছে পিটার কলিনসনকে লেখা এক চিঠি থেকে। তাতে জানা যায় যে, জলে ভিজে যাওয়া বা ঝড়ে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর ঘুড়িটি তৈরি করেছিলেন একটি রেশমী রুমাল দিয়ে। মেঘের বিদ্যুৎকে সহজে পাকড়াও করতে একটি ফুটখানেক লম্বা লোহার তার ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ঘুড়িটির মাথায়। ঘুড়িটিতে বাঁধা একটা লম্বা টন সুতোর অন্য প্রান্তে লাগানো হয় রেশমী ফিতে। এই ফিতের অংশটি হাতে ধরা ছিল, যখন ঘুড়িটি ওড়ানো হয় আকাশে। সুতো ও রেশমী ফিতের সংযোগস্থলে ছিল একটি ধাতু নির্মিত সুইচ্। ঐ সুইচের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক লীডেন জারকে। ঘুড়ি যখন আকাশে—মেঘের বিদ্যুৎ লোহার তার, ঘুড়ি, টন সুতো, ধাতু-সুইচ্ মারফৎ এসে জমা হয়েছিল লীডেন জার-এ। বর্ণনায় জানা যায়, লীডেন জার-এ বিদ্যুতের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ভাঁজ করা আঙুলের গাঁটকে ঐ সুইচের কাছাকাছি এনে বিদ্যুৎ শক্-এর অনুভূতিও পেয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন।

ফ্র্যাঙ্কলিনের এই সফল পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে কেবলমাত্র বিবরণের ভিত্তিতেই মেঘ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ফ্রান্সের ডালিবার্ড এবং ডে'লোর। সেটা ছিল ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের একটা দিন। মেঘের বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে ডালিবার্ড-এর পরীক্ষাগারে সব আয়োজন সমাপ্ত; কিন্তু তিনি নিজে সেদিন অনুপস্থিত। তাঁর পরীক্ষাগারে কাজ করছিলেন কয়ফিয়ের নামে একজন ছুতোর মিস্ত্রী। বাইরে তখন মেঘের ঘনঘটা। হঠাৎ বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ। ছুতোর মিস্ত্রীর চোখ গেল লীডেন জার-এর দিকে। মুহূর্তের জন্য লীডেন জার-এ তিনি দেখলেন মেঘের বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ। ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মে তারিখে অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কলিনের পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে।

‘পরীক্ষাগারে প্রকৃতির বিদ্যুৎকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেন একজন ছুতোর মিস্ত্রী'—সময়ের হিসেবে ইতিহাসের এই দাবীকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ফ্র্যাঙ্কলিনের বর্ণনা অনুসারে একের পর এক সাফল্য আসতে থাকে বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে এই পরীক্ষাগুলিতে। মেঘের বিদ্যুৎকে টেনে আনতে সফল হ'লেন ফ্রান্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঁসিয়ে ডে-লোর, তাঁর প্যারিসের বাড়িতে ৯৯ ফুট উঁচু লোহার রড বসিয়ে। জানা যায়, রয়াল সোসাইটির সদস্য ডক্টর ক্যান্টন তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতে একটি সুতীক্ষ্ণ মাছ ধরার রড বসিয়ে বজ্রবিদ্যুৎকে টেনে নামাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়া মেঘের বিদ্যুতের ভয়াবহ পরিণতিকে ঠেকাতে ফ্র্যাঙ্কলিন আবিষ্কার করেছিলেন বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড—লাইটনিং কনডাক্টর। তাঁর এই আবিষ্কারকে মেনে নেওয়ার পথে অনেক বাধা এসেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইতিহাসের পাতা থেকে।

সেটা ছিল ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ। স্থির হ'ল, সেণ্ট ব্রাইড্ গীর্জার ওপর বজ্রপাতের ভয়ানক পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে লণ্ডনের সেণ্ট-পল্ গীর্জার মাথার ওপর বসানো হবে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড। রয়াল সোসাইটির নির্দেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হ'ল। ঐ কমিটিতে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সাথে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও বেঞ্জামিন উইলসন-এর নাম ছিল। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সেণ্ট পল্ গীর্জায় বসানো হ'ল

ফ্র্যাঙ্কলিন নির্দেশিত বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড। লণ্ডন শহরে এই প্রথম সরকারীভাবে চালু হ'ল বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ডের।

এটি বসানোর মাত্র তিন বছরের মাথায় সেণ্ট পল্ গীর্জায় বাজ পড়ল। ঐ বজ্রপাতে গীর্জার কোন ক্ষতি না হ'লেও চার ইঞ্চি চওড়া আধা ইঞ্চি পুরু পাত দিয়ে তৈরি লোহার দণ্ডটির কোন কোন অংশ একেবারে তপ্ত লাল হয়ে গিয়েছিল।

ঐ একই বছরে দ্বিতীয়বার সরকারীভাবে আর একটি কমিটি বসানো হ'ল। গোলাবারুদের সংগ্রহকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করতে Purfleet-এ অবস্থিত গোলাবারুদের মজুত ঘরের মাথায় লাইট্নিং অ্যারেস্টার বসাবার কাজে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত জানতে চাওয়া হ'ল। ঐ কমিটিতে ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন উইলসন, ওয়াট্সন, ক্যাভেনডিশ, রবার্টসনের মতন বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। সকলেই ফ্র্যাঙ্কলিন প্রস্তাবিত ডিজাইনের বজ্রপাত নিরোধক দণ্ডের কার্যকারিতা বিষয়ে একমত হ'লেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রস্তাবে বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ডের পরিবাহীর অগ্রভাগকে হ'তে হবে সুতীক্ষ্ণ। ঐ কমিটির মাত্র একজন সদস্য বেঞ্জামিন উইলসন্ কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রস্তাবকে মেনে নিলেন না। কেবলমাত্র তিনিই সুতীক্ষ্ণ পরিবাহীর পরিবর্তে পরিবাহীর অগ্রভাগে 'নব্' (Knob) রেখে ভোঁতা করার যুক্তি দিলেন। উইল্সনের মতে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ডটির অগ্রভাগ 'সরু' হওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ সুতীক্ষ্ণ পরিবাহী অনেক দূরের মেঘের বিদ্যুৎকেও পৃথিবী পৃষ্ঠে অনায়াস আমন্ত্রণ জানাবে। উইলসন-এর ঐ তত্ত্বগত যুক্তিকে মেনে নিলেও পরিবাহীর অগ্রভাগকে 'ভোঁতা' রাখার বিরুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কলিনের মতবাদটি ছিল অত্যন্ত সহজগ্রাহ্য। তিনি বলেছিলেন, "সুতীক্ষ্ণ পরিবাহী অত্যন্ত ধীরে এবং নিঃশব্দে টেনে আনবে অনেক দূরের মেঘের বিদ্যুৎ; কিন্তু নব্-যুক্ত অর্থাৎ 'ভোঁতা' পরিবাহীতে মেঘের বিদ্যুৎ আছড়ে পড়বে বিকট শব্দে।"

এখানেই শুরু হয়ে গেল ফ্র্যাঙ্কলিনের মতের বিপক্ষে বেঞ্জামিন উইলসনের প্রকাশ্য বিরোধ। উইল্সন তাঁর সপক্ষে যুক্তি টেনে প্রকাশ করলেন বিশাল বিশাল প্রবন্ধ। ফ্র্যাঙ্কলিন কিন্তু নির্বিকার; তিনি তাঁর মতে স্থির, অবিচল।

উইলসনের এই প্রকাশ্য বিরোধ যখন চরমে ঠিক তখনই, ঘটনাচক্রে, Purfleet-এর গোলাবারুদের স্তূপের ওপর ঘটল বজ্রপাত। ফ্র্যাঙ্কলিনের বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ডটি বারুদ স্তূপের ভয়ানক বিস্ফোরণ ঠেকাতে পারলেও, ঐ বজ্রপাতে মজুত ঘরের সামান্য কিছু ক্ষতি হয়েছিল। একই সময়ে ফ্র্যাঙ্কলিন নির্দেশিত দণ্ড বসানো সত্ত্বেও বজ্রপাতের ফলে টেণ্টারডেন-এ অবস্থিত একটি বাড়ীরও কিছু ক্ষতি হয়েছিল। ক্ষতিসাধনের এইসব সূত্র ধরে উইলসন স্বভাবতঃই জয়ের আনন্দ অনুভব করেছিলেন। জয়ের আনন্দকে নিশ্চিত করতে, উইলসন তাঁর খুঁটি আরও জোরদার করলেন—তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জকে তাঁর মতে প্রভাবিত করে। রাজাকে প্রভাবিত করতে বেঞ্জামিন উইলসনের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি, একটি মাত্র কারণে। কারণটি হ'ল, বৃটিশ রাজ-এর বিরুদ্ধে আমেরিকান বিপ্লবী ফ্র্যাঙ্কলিনের সক্রিয় ভূমিকা।

বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড প্রসঙ্গে দুই বেঞ্জামিন-এর এই মতবিরোধ চলতে লাগল। রয়াল সোসাইটির সদস্যদের মধ্যেও ক্রমশঃ বিভ্রান্তি দেখা দিল। বজ্রপাতজনিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ডের অগ্রভাগ ফ্র্যাঙ্কলিন-এর মতানুসারে সরু (pointed) বা উইলসন-এর মতানুসারে ভোঁতা (blunt)—উপযুক্ততার বিচারে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে লাগল। এই মতবিরোধকে electrical quarrel বা বৈদ্যুতিক ঝগড়া বলে অভিহিত করেছেন পরবর্তীকালের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

এই প্রসঙ্গে উইলসনের মতের পক্ষে রাজা তৃতীয় জর্জ-এর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করার মতন। জানা যায়, ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই মতপার্থক্য যখন চরমে, রাজা তৃতীয় জর্জ ব্যাকিংহাম রাজপ্রাসাদের lightning conductor-এর সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের পরিবর্তে বেঞ্জামিন উইল্সন পরিকল্পিত blunt বা 'ভোঁতা' পরিবাহী বসাবার নির্দেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Weld-এর মন্তব্যটি বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, 'বিজ্ঞান-গত কারণে নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে রাজা তৃতীয় জর্জ, উইল্সনের পক্ষ সমর্থন করেছেন।'

ক্রমে রয়াল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক মহামান্য রাজা প্রত্যক্ষভাবে সোসাইটির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন—বেঞ্জামিন উইলসনের blunt বা ভোঁতা পরিবাহীকে স্বীকার করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে ইংলণ্ড এমনকি আমেরিকান কলোনীগুলির সাধারণ মানুষও ফ্র্যাঙ্কলিনের মতকে মেনে নিতে দ্বিধা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Weld-এর মত উপেক্ষা করার নয়। তিনি বলেন—'জগতে যুগে

যুগে সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রভাবান্বিত করতে রাজনীতিকদের ভূমিকা বিশেষভাবে সক্রিয়। সেখানে বিষয় হোক না বৈজ্ঞানিক, তথাপি কেবলমাত্র বিজ্ঞানীর আদর্শ বা সত্য জনমতের ওপর এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।' এইভাবেই সম্পূর্ণ কূটনীতিক কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ বিষয়ে মতবাদও উপেক্ষিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকান কলোনীগুলির যুদ্ধ বিবাদ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাবাসী ফ্র্যাঙ্কলিনের Pointed Conductor-এর মতবাদও ততই দূরে সরে যাচ্ছিল—মহামান্য রাজার প্রত্যক্ষ প্রভাবে। 'সরু' বা 'ভোঁতা' নিয়ে বিজ্ঞান জগতের এই মতবিরোধটি ক্রমে রাজনীতির জগতে প্রবেশ করল। ফলে সেইসময় আমেরিকা বা ইংলণ্ড-এর রাজনৈতিক নীতি সমর্থনের প্রশ্নে 'সরু' বা 'ভোঁতা' এই সংক্ষিপ্ত অথচ পরোক্ষ জবাবটি যথেষ্ট বলে মনে করা হত।

রাজার প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ল রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট জন প্রিঙ্গল (John Pringle)-এর ওপর। তিনি উইলসনের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেসিডেণ্ট-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। সেটা ছিল ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি। রাজা সরাসরি জন প্রিঙ্গলকে অনুরোধ করলেন উইলসন প্রস্তাবিত ভোঁতা পরিবাহীর মতকে স্বীকৃতি দিতে। জন প্রিঙ্গল রাজার এই প্রস্তাবে ভীষণ-ভাবে মর্মাহত হ'লেন। কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজার অনুরোধের উত্তরে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, "মহাশয়, আমি প্রকৃতির বিধান বা কার্যকারণের অন্যথা করতে পারি না।" এই সহজ অথচ স্পষ্ট উত্তরের জন্য রাজা একটুও প্রস্তুত ছিলেন না হয়ত। তৎক্ষণাৎ তিনি জন প্রিঙ্গলকে তাঁর কার্যভার থেকে অবসর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সত্য যখন আক্রান্ত; দৃঢ়চেতা জন প্রিঙ্গল স্বেচ্ছায় তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন রয়াল সোসাইটিতে। রাজার অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা অনুরোধকে দৃঢ়ভাবে উপেক্ষা করে এবং প্রেসিডেণ্ট পদ প্রত্যাখ্যান করে স্যার জন প্রিঙ্গল রয়াল সোসাইটির ইতিহাসে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকলেন।

বিজ্ঞান সর্বদা সত্যকে মেনে চলে। অতএব বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনে ক্ষুদ্রস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়াটাই একজন সত্যসন্ধানী দার্শনিকের অবশ্য কর্তব্য। পূর্বসুরী অ্যারিস্টট্ল, প্লেটো সক্রেটিস-এর মতন স্যার জন প্রিঙ্গল তাঁর আদর্শ ও নীতির মধ্য দিয়ে আরেকবার সেটা প্রমাণ করে দিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে ফ্র্যাঙ্কলিন নিজে তাঁর তত্ত্বগত সত্যের বিরোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মত যদি সত্য হয় তবে তা আপনিই প্রতিষ্ঠা পাবে বিশ্ব মাঝে—এই ছিল তাঁর মনোভাব। বিবাদ বিতর্ক কেবল তিক্ততা ও অশান্তি বাড়িয়েই চলে। ফ্র্যাঙ্কলিন বরাবর তা এড়িয়ে গেছেন। বরং তিনি ক্ষোভের সাথে জানিয়েছিলেন তাঁর এই আবিষ্কারটি অযোগ্য প্রমাণ করে বাতিল করে দেওয়া-হোক; এতে অন্ততঃ তিক্ততার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

বাজ-নিরোধক প্রসঙ্গে বেঞ্জামিনদ্বয়ের দ্বিমতবাদের তিক্ততা চলেছিল বেশ কয়েক বছর। কিন্তু আমরা দেখি, কালক্রমে ফ্র্যাঙ্কলিন-এর মতবাদটি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত হয়েছিল বিজ্ঞানের জগতে।

বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম,
১৯এ, গুরুসদয় রোড, কলি-১৯

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

লাল গ্রহ—মঙ্গল

বিমান বসু

সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহ হল মঙ্গল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে লাল রংএর এই গ্রহটি বড় বিতর্কমূলক গ্রহ। ঐ বিতর্ক হলো মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা তা নিয়ে। গত প্রায় এক শতাব্দি ধরে মানুষের ধারণা ছিল যে মঙ্গলে সত্যিই বুদ্ধিমান জীবের বাস আছে, আর এই নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীও লেখা হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলেসের বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লডস্' তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই পড়েছ। ১৮৯৭ সালে লেখা এই বইটিতে ওয়েল্‌স্ মঙ্গলের কাল্পনিক বুদ্ধিমান অধিবাসীদের দ্বারা পৃথিবীর ওপর আক্রমণের এক রোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন যা সে সময় অনেকেই সত্যি বলে মনে করেছিলেন। আবার শুধু সাহিত্যেই নয় মঙ্গলগ্রহের ওপর জীবের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানা বিতর্ক চলেছে। এমন কি গত দশকে মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে যে সব গ্রহযান পাঠানো হয়েছে সেগুলিরও প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সেখানে জীবের সন্ধান করা! কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব তো দূরের কথা কোনও রকম জীবাণুরও অস্তিত্ব নেই। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, তাহলে এরকম একটা ধারণা এলো কোথা থেকে? এর পেছনে আছে এক লম্বা কাহিনী।

গ্রহ হিসেবে মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। এর ব্যাস হলো মাত্র ৬৭৯৮ কিলোমিটার, মানে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এর ভর পৃথিবীর ভরের মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ, অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের তুলনায় প্রায় ৩ ভাগের ১ভাগ। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের অনেক ব্যাপারে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর মত মঙ্গলও তার অক্ষতলে হেলে আছে আর দুইয়ের অক্ষেরনতির পরিমাণও প্রায় একই। মঙ্গলের অক্ষ তার কক্ষতলে ২৫ ডিগ্রী হেলে আছে, সে তুলনায় পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে ২৩½ ডিগ্রী। এর ফলে মঙ্গলেও পৃথিবীর মত বার্ষিক ঋতুচক্র আছে। অবশ্য যেহেতু মঙ্গলের দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে বেশী, সেজন্য সূর্যের চারপাশে একপাক ঘুরতে মঙ্গলের লাগে প্রায় ৬৮৭ দিন। সুতরাং মঙ্গলের বিভিন্ন ঋতুর স্থিতিকালও পৃথিবীর তুলনায় বেশী।

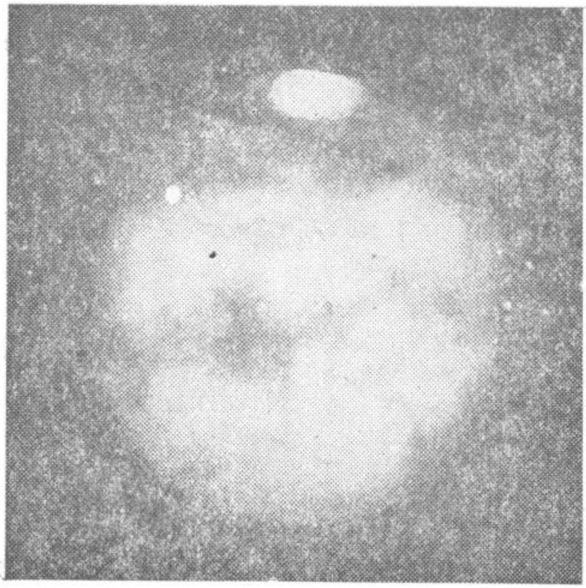

পৃথিবী থেকে তোলা মঙ্গলের ছবি। ওপরের সাদা অংশটা হলো মঙ্গলের মেরুর টুপি।

আরও একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য হলো আহ্নিক গতির বেলায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবীর নিজের অক্ষে একবার পাক খায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট চার সেকেণ্ড। সে তুলনায় মঙ্গল নিজের অক্ষে একবার ঘোরে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড। মানে দুটি গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। এছাড়া পৃথিবীর মত মঙ্গলেরও নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় খুবই হাল্কা।

মঙ্গলের বিষয় এই সব তথ্য অনেক দিন আগেই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তাঁরা আরও জানতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চলের মত মঙ্গলের দুই মেরুতেও সাদা টুপির মত এলাকা আছে যা ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে বাড়ে কমে। এছাড়া মঙ্গলের গায়ে গাঢ় ছোপের মত দাগও তাঁদের চোখে পড়েছিল যার গতি থেকেই মঙ্গলের আহ্নিক গতির সঠিক সময় নির্ধারণ তাঁরা করতে পেরেছিলেন। মোট কথা গত শতাব্দির সপ্তম দশক পর্যন্ত দূরবীনের সাহায্যে মঙ্গলের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও কারও মনে মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনার কথা আসেনি। সে ঘটনা ঘটে আরও পরে।

সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর পরবর্তী গ্রহ হওয়ার দরুন মঙ্গল গ্রহ কখনও কখনও পৃথিবীর খুবই কাছে এসে পড়ে। দেখা গেছে যে প্রতি ১৫ থেকে ১৭ বছর পর পর একবার মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, মানে প্রায় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে চলে আসে। সে সময় যে কোনও মাঝারি সাইজের দূরবীনেও মঙ্গলকে দেখায় পূর্ণিমার চাঁদের মত বড়। ঐ সময় মঙ্গলের অনেক বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে।

১৮৭৭ সালের আগস্ট মাসেও মঙ্গল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। ঐ সময় দূরবীন দিয়ে মঙ্গলকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গিওভানি সিয়াপারেলি। তাঁর চোখে পড়ল মঙ্গলের গায়ে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম রেখা। সরল রেখার মত ঐ দাগগুলির তিনি নাম দিলেন canali ইতালীয় ভাষায় যার মানে হলো 'খাঁজ'। কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ canali-কেই বিজ্ঞানীরা ভুল করে Canal বা খাল বলেই ধরে নিলেন।

এর পর ১৮৯৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল বললেন যেহেতু মঙ্গলের 'খাল'গুলির গঠন সরল রেখার মত, সেগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম ভাবে তৈরী। আর যদি সত্যই তাই হয় তবে মঙ্গলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জীব আছে।

লোয়েলের এরকম ধারণার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। তা হলো মঙ্গলের মেরুর টুপি আর তার গায়ের পরিবর্তনশীল গাঢ় ছোপ। আগেই বলেছি মেরু টুপির আয়তন ঋতু হিসেবে বাড়ে কমে। লোয়েল দেখলেন মঙ্গলের গায়ের গাঢ় ছোপও ঋতুতে ঋতুতে পাল্টে যায়। আর এই পাল্টে যাওয়ারও একটা নির্দিষ্ট চক্র আছে। লোয়েল এ সব ঘটনার একটা খুব সরল ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলেই মেরু টুপির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আর মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলে জল নিয়ে যাওয়ার জন্যই মঙ্গলের অধিবাসীরা গ্রহব্যাপী ঐ সব কৃত্রিম খাল তৈরী করেছে। লোয়েল আরও বললেন যে মঙ্গলের গায়ের ঐ গাঢ় ছোপ আসলে হলো উদ্ভিদ ঢাকা এলাকা যা ঋতু পরিবর্তনের সাথে বদলায়। সবে মিলে লোয়েল মঙ্গলের জগৎটাকে প্রায় পৃথিবীর অনুরূপ বলেই মেনে নিয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে জন্মেছিল মানুষের মনে মঙ্গল গ্রহে জীবের বিভ্রান্তিকর ধারণা। লোয়েলের ব্যাখ্যায় যে সত্যিই কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল তা নয়। এ ছিল সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। কিন্তু হলে কি হবে, যেহেতু লোয়েল ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তাঁর ভুল ধারণকেও সাধারণ মানুষ সত্যি মেনে নিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দিতে এসে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণারও অনেক পরিবর্তন হয়। তাঁরা জানতে পারেন যে মঙ্গলের ওপর আসলে কোনও খাল নেই, আর সেখানে সত্যিই যে জল আছে তারও কোন প্রমাণ নেই। মঙ্গলের মেরুটুপি সম্বন্ধেও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। জানতে পারা যায় যে সেগুলি প্রধানতঃ জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসেরই তৈরী। তবে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় গত দু'দশকের মহাকাশ অভিযানের ফলে।

মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে প্রথম গ্রহযান পাঠানো হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর। মেরিনার-৪ নামক গ্রহযানটি প্রায় সাড়ে সাত মাস পরে, ১৯৬৫ সালের ১৪ই জুলাই মঙ্গলগ্রহের ৯,৮০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। সে সময় পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল ২১ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার। এর চার বছর পর পাঠানো হয় আরও দুটি মেরিনার গ্রহযান। মেরিনার-৬ ছাড়া হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে, মেরিনার-৭ কে ছাড়া হয় ২৬ মার্চ ১৯৬৯ তারিখে। দুটি গ্রহযানই মঙ্গলগ্রহের প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়, মেরিনার-৬ ৩১ জুলাই তারিখে আর মেরিনার-৭ ৫ আগস্ট ১৯৬৯ তারিখে। তিনটি গ্রহযান থেকেই মঙ্গল গ্রহের উপরিতলের অনেক ছবি পাওয়া যায়। সেগুলিতে দেখা যায় যে মঙ্গলের উপরিতলও চাঁদের মত অসংখ্য গহ্বরে ভরা। মেরিনার-৭ মঙ্গলের মেরুটুপির বিষয়েও অনেক নতুন তথ্য পাঠায়।

এর পর ১৯৭১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 'মারস্-২' এবং 'মারস্-৩' নামক দুটি গ্রহযান মঙ্গল অভিমুখে পাঠায়। দুটি গ্রহযানই প্রথমে মঙ্গলের কক্ষে পৌঁছে সেখান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং পরে অবতরণ যান নামায়। কিন্তু দুটি অবতরণ যানই নামবার সময় নষ্ট হয়ে যায়।

১৯৭১ সালেই মঙ্গল অভিমুখে আরও দুটি মেরিনার গ্রহযান ছাড়া হয়। এদের মধ্যে প্রথমটি, মেরিনার-৮, ছাড়বার সময়েই সমুদ্রে পড়ে যায়। অপরটি মেরিনার-৯, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মঙ্গলের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। মঙ্গলে তখন বড়ো রকমের একটা ধূলিঝড় চলছিল যা প্রায় গোটা গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। বিজ্ঞানীদের কাছে এ ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। মঙ্গলের ওপর ধূলিঝড়ের হদিস তাঁরা এর আগেও পেয়েছিলেন,

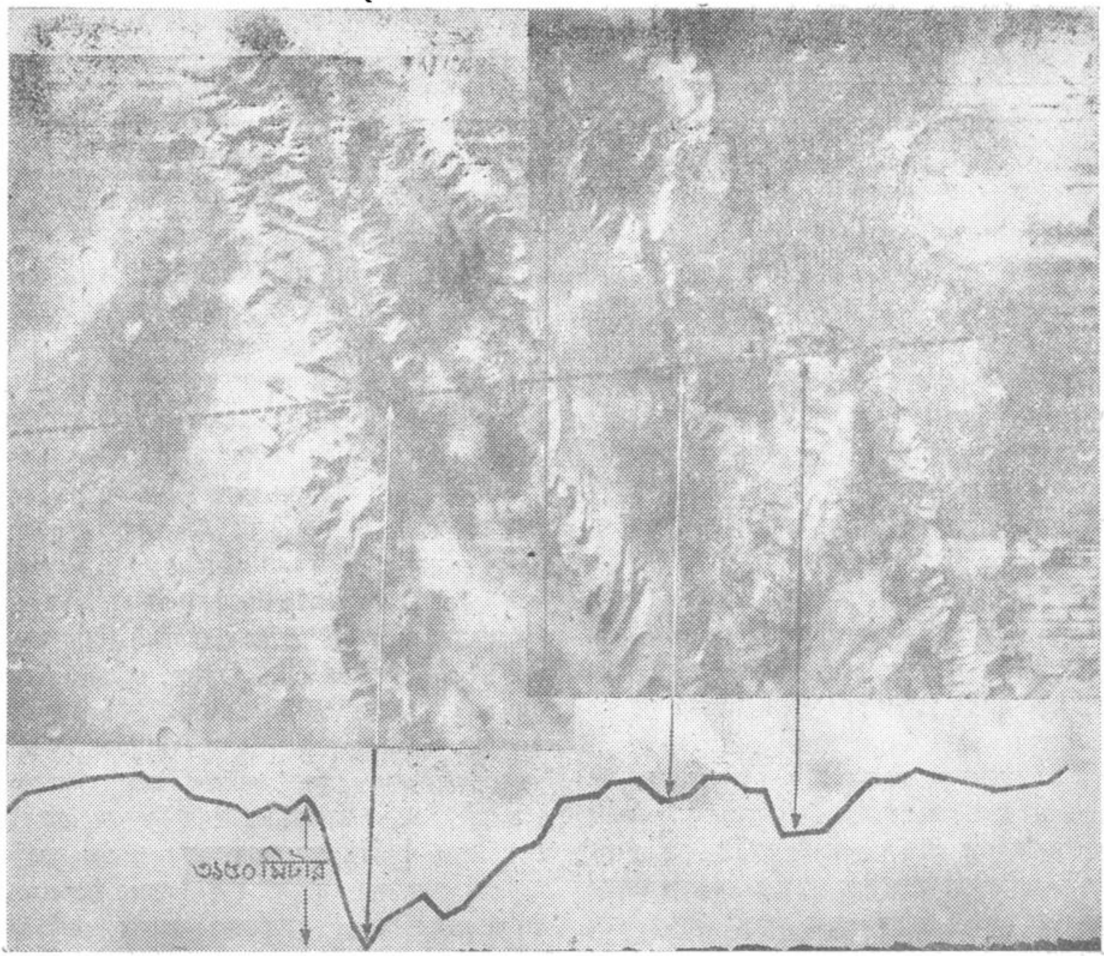

মেরিনার-৯ থেকে তোলা মঙ্গলের বিশাল গিরিখাতের কিছু অংশ। নিচে খাদের গভীরতা দেখানো হয়েছে।

কিন্তু তা যে এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তা ছিল তাঁদের কল্পনার বাইরে। সে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার।

অবশেষে ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে মঙ্গলের সেই গ্রহব্যাপী ঝড় থামলো। মেরিনার-৯ তখন মঙ্গলের চারপাশে কক্ষপথে পরিক্রমা করে চলেছে। ধুলিঝড় থেমে যাওয়ার পর মেরিনার-৯ এর ক্যামেরার চোখে ধরা পড়লো মঙ্গলের এক নতুন রূপ। গ্রহযানটি থেকে পাঠানো ছবিতে দেখা গেল মঙ্গলে আছে বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরি এবং গভীর গিরিখাত যার নজীর আমাদের পৃথিবীতে নেই। মঙ্গলের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি হলো 'নিক্স্ অলিম্পিয়া'। এর ব্যাস প্রায় ৬০০ কিলোমিটার আর উচ্চতা অন্ততপক্ষে ২৬ কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরি হাওয়াই দ্বীপের মনা লোয়ার ব্যাস হলো ২০০ কিলোমিটার আর উচ্চতা মাত্র ৯ কিলোমিটার (এখানে অবশ্য উচ্চতা বলতে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে নিয়ে চূড়োর উচ্চতার কথা বলছি)। বিজ্ঞানীদের মতে নিক্স্ অলিম্পিয়া হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি।

গিরিখাতের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের গিরিখাতগুলি অতি বিশাল এবং গভীর। পৃথিবীর উপর সবচেয়ে বড় গিরিখাত হলো আমেরিকার

মঙ্গলের ওপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত আঁকাবাঁকা রেখা।

'গ্রাণ্ড-ক্যানিঅ্যান। এর দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার, সবচেয়ে বেশী গভীরতা প্রায় ১৮০০ মিটার আর প্রস্থ কোথাও ১৯ কিলোমিটারের বেশী নয়। সে তুলনায় মঙ্গলের সবচেয়ে বড় গিরিখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭০০ কিলোমিটার, গভীরতা প্রায় ৬৫০০ মিটার আর প্রস্থ ২৪০ কিলোমিটার। কি অতিকায় সে গিরিখাত তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ।

মেরিনার-৯ থেকে পাঠানো ছবিতে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাওয়া গেল। দেখা গেল মঙ্গলের উপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত বহু আঁকা বাঁকা রেখা যাতে অতীতে কোনও সময়ে জল প্রবাহের চিহ্ন পরিষ্কার চোখে পড়ে। ঐ সব দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করেন মঙ্গল গ্রহে অতীতে কোনও সময় নিশ্চয়ই প্রচুর জল ছিল। মেরিনার-৯ থেকে পাঠানো তথ্য থেকে আরও জানতে পারা গেল যে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের সাদা টুপি বেশীর ভাগটাই জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড হলেও তাতে কিছুটা জলের বরফও আছে। বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে মেরু টুপির কার্বন ডাই অক্সাইড উবে গিয়ে শুধু মাত্র এক কিলোমিটার পুরু জলের বরফের স্তর রয়ে যায় যা মঙ্গলের ঠাণ্ডায় কখনই গলতে পারে না।

মেরিনার—৯ থেকে মঙ্গলের গাঢ় ছোপেরও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। দেখা গেল ঝড়ে উড়ে যাওয়া বালির আস্তরণের রদবদলের দরুনই ওটা হয়। গ্রহযানটি থেকে পর্যবেক্ষণের সময় এমনি ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পর পর তোলা ছবিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। দেখা গেছে প্রথমে যা ছিল ছোট একটা গাঢ় ছোপ, পরে ধুলো উড়ে গিয়ে নিচের মাটি বেরিয়ে পড়ার ফলে সেটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এখানে কোনও উদ্ভিদও নেই জলও নেই।

মেরিনার—৯ এর পর ১৯৭৩ সালে তিনটি 'মারস্' গ্রহযান মঙ্গলে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে দুটি, 'মারস্'-৪ এবং মারস্-৫, মঙ্গলের কক্ষ থেকে ছবি এবং অন্যান্য তথ্য পাঠায়। মারস্-৬ গ্রহযানটি মঙ্গলের ওপর নামতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর ১৯৭৫ সালে পাঠানো হয় দুটি ভাইকিং গ্রহযান মঙ্গলে জীবের সন্ধান করতে। ভাইকিং—১ মঙ্গলের ওপর গিয়ে নামে ২০ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে আর ভাইকিং—২ নামে আরও ৭৪০০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখে। দুটি গ্রহযানেই মঙ্গলের উপরিতলের মাটি খুঁড়ে তাতে কোনও জৈব বিক্রিয়ার লক্ষণ আছে কিনা তার অধ্যয়ন করবার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও মঙ্গলের মাটিতে জীবনের কোনও লক্ষণই

যে সব গ্রহযান মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়েছে

গ্রহযান	যাত্রা শুরু	পৌঁছনোর তারিখ	কি কি করেছে
১। মেরিনার—৪	২৮ নভেম্বর ১৯৬৪	১৪ জুলাই ১৯৬৫	মঙ্গল গ্রহের ৯,৮০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ছবি তুলে পাঠায়।
২। মেরিনার—৬	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	৩১ জুলাই ১৯৬৯	মঙ্গল গ্রহের ৩,৩৯০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায় এবং ছবি তুলে পাঠায়।
৩। মেরিনার—৭	২৬ মার্চ ১৯৬৯	৫ আগস্ট ১৯৬৯	মঙ্গলের ৩,৫০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবার সময় ছবি তুলে পাঠায়।
৪। মার্স্—২	১৯ মে ১৯৭১	২৭ নভেম্বর ১৯৭১	মঙ্গলগ্রহে নামবার সময় নষ্ট হয়ে যায়।
৫। মার্স্—৩	২৮ মে ১৯৭১	২ ডিসেম্বর ১৯৭১	মঙ্গলগ্রহের ওপর নামবার মাত্র ২০ সেকেণ্ডের মধ্যেই সংকেত পাঠানো বন্ধ করে দেয়।
৬। মেরিনার—৯	৩১ মে ১৯৭১	১৩ নভেম্বর ১৯৭১	মঙ্গল গ্রহের কক্ষে পৌঁছে সেখান থেকে মঙ্গলের উপরিতল, বায়ুমণ্ডল এবং তার দুই উপগ্রহের প্রায় ৭,৫০০ ছবি ও অন্যান্য তথ্য পাঠায়।
৭। মার্স্—৪	২১ জুলাই ১৯৭৩	জানুয়ারী ১৯৭৪	মঙ্গল গ্রহের ২,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ছবি তুলে পাঠায়।
৮। মার্স্—৫	২৫ জুলাই ১৯৭৩	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪	মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ থেকে ছবি ও তথ্য পাঠায়।
৯। মার্স্—৬	৫ আগস্ট ১৯৭৩	১২ মার্চ ১৯৭৪	মঙ্গলগ্রহের ওপর নামবার পরই সংকেত পাঠানো বন্ধ করে দেয়।
১০। ভাইকিং-১	২০ আগস্ট ১৯৭৫	১৯ জুলাই ১৯৭৬	মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছানোর পর জীবন সন্ধানী বিশেষ যন্ত্রপাতি সমেত অবতরণ যান নামায়। মঙ্গলের মাটি তুলে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং উপরিতল থেকে রঙিন ছবি পাঠায়।
১১। ভাইকিং-২	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫	৭ আগস্ট ১৯৭৬	কক্ষপথে পৌঁছানোর পর ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে যন্ত্রপাতি সমেত অবতরণ যান নামায়। উপরিতলে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় এবং ছবি তুলে পাঠায়।

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের তিনটি দুর্দ্ধর্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক
উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—
মেঘনাদ ৮.০০ গুপ্তধন ৮.০০ তুষার লোকের রহস্য ৮.০০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

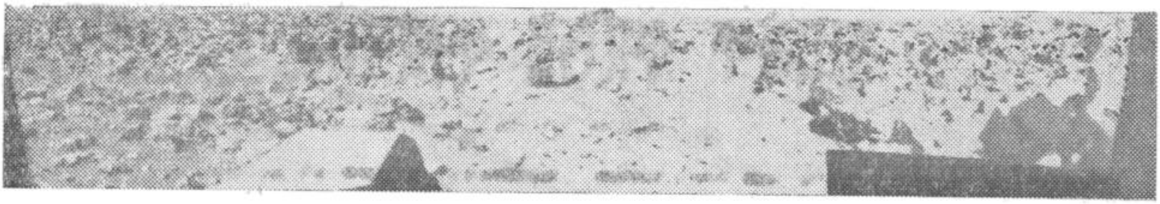

ভাইকিং-এর বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে তোলা মঙ্গলের উপরিতলের দৃশ্য। সামনে পাথর ছড়ানো মরুভূমি দেখা যাচ্ছে।

খুঁজে পাওয়া যায় নি।

অবশ্য ভাইকিং থেকে পাঠানো ছবি এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে মঙ্গলের বিষয়ে অনেক কিছু নতুন জানতে পারা গেছে। জানতে পারা গেছে যে মঙ্গলের উপরিতল হলো পাথরভরা লাল মরুভূমির মত, সেখানকার আকাশ হালকা লালচে, মেঘহীন। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল খুবই হাল্কা, সেখানের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের একশো ভাগের মাত্র এক ভাগ। তাতে আছে শতকরা ৯৫ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড, ২'৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১'৫ ভাগ আর্গন গ্যাস, ০'১ ভাগ অক্সিজেন এবং সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাস।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন—মঙ্গলের ওপর তাপমান যে কম হবে তা নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পেরেছ। দেখা গেছে সেখানে তাপমান শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াসের ওপরে প্রায় ওঠেই না। ভাইকিং গ্রহযান যেখানে নেমেছিল সেখানের তাপমাত্রা ছিল দিনে মাইনাস ৩০ ডিগ্রী এবং রাত্রে মাইনাস ৮৫ ডিগ্রী। মেরিনার থেকে মাপজোক নিয়ে দেখা গেছে যে মেরু অঞ্চলের তাপমান মাইনাস ১২৫ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। অবশ্য গ্রীষ্মকালে বিষুব অঞ্চলে দিনের তাপমান ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতেও দেখা গেছে।

মঙ্গলের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে পৃথিবীর মাটির তুলনায় মঙ্গলের মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লোহা জাতীয় অক্সাইড থাকার দরুনই মঙ্গলের মাটি মরচের মত লাল। এক্সরে দিয়ে মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাতে আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়ম, সিলিকন এবং গন্ধক। সেখানের পাথরের গঠন অনেকটা আগ্নেয়গিরির লাভাজমাট বেঁধে তৈরী ব্যাসাল্টের মত।

মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি। নাম ফোবোস এবং ডাইমোস। উপগ্রহ দুটি এত ছোট আর সেগুলির কক্ষপথ এত কাছে যে শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া সেগুলিকে দেখা যায় না। উপগ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আসাফ্ হল্, ১৮৭৭ সালে। দুটি উপগ্রহই হলো এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরোর মত দেখতে। ফোবোস ২২ কিলোমিটার লম্বা ১৬ কিলোমিটার চওড়া, ডাইমোস ১১ কিলোমিটার লম্বা ৯ কিলোমিটার চওড়া। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব মাত্র ৬০০০ কিলোমিটার, মঙ্গলের এক পাক খেতে তার সময় লাগে মাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট। এত দ্রুত ঘোরে বলে মঙ্গলের উপর থেকে ফোবোসকে পশ্চিম দিকে উঠতে আর পূব দিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে মঙ্গলের একদিনে ফোবোস দুবার উদয় হয় আর দুবার অস্ত যায়। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত ফোবোস আকাশে থাকে মাত্র ৫½ ঘণ্টা।

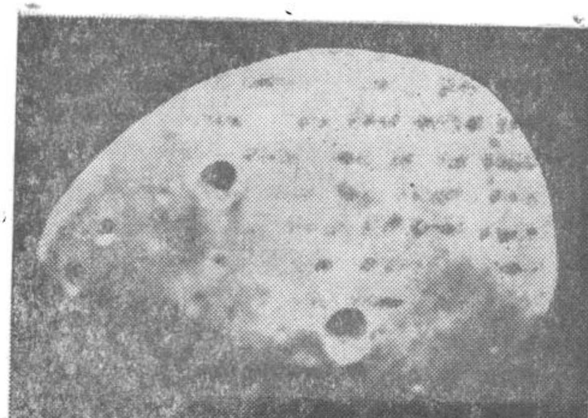

মঙ্গলের উপগ্রহ ডাইমোস।

ডাইমোসের কক্ষপথ অনেক বেশী বড়। মঙ্গল থেকে ডাইমোসের দূরত্ব প্রায় ১৯,৩০০ কিলোমিটার। মঙ্গলের কক্ষপথে একবার ঘুরতে ডাইমোসের সময় লাগে ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। মানে মঙ্গলের আকাশে পূর্বে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে ডাইমোসের সময় লাগে প্রায় ২½ দিন। এই দুটো উপগ্রহেরই দূরত্ব এত কম যে মঙ্গলের মেরু অঞ্চল থেকে এদের কোনটিকেই দেখতে পাওয়া যায় না, এ গুলি সব সময়েই দিগন্তের নিচে থাকে। (ক্রমশঃ)

ম্যাজিক কার্ডের কারসাজি

সিদ্ধার্থ ঘোষ

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাতটা ম্যাজিক কার্ড ভরা প্যাকেটটা নিশ্চয় তোমরা সকলেই পেয়েছ। এত দিনে খেলাটা নিশ্চয় তোমাদের কাছে পুরনোও হয়ে গেছে। এক খেলা আর কত বার দেখাবে! খুব সত্যি কথা। কিন্তু খেলা দেখাতে গিয়ে প্রশ্নটা তোমাদের নিশ্চয় শুনতে হয়েছে—কি করে এমন হচ্ছে? কি করে ম্যাজিক কার্ডগুলো তৈরি করা হয়েছে সে কথাটা তোমাদের এবার বলি তাহলে।

ম্যাজিক কার্ডের প্যাকেটের মধ্যে সংখ্যা লেখা কার্ড আছে ছ'টা আর একটার ওপর লেখা আছে 'ম্যাজিক-কার্ড' এবার থেকে প্রথম ছ'টা কার্ডকে সংখ্যা-কার্ড বলব, আর সংখ্যা ছাড়া কার্ডটাকে বলব ম্যাজিক-কার্ড।

তোমরা যে কোন একটা সংখ্যা-কার্ড নিয়ে তার ওপর সমান ক'রে ম্যাজিক কার্ডটা বসাও। কি দেখছ বলতো? ম্যাজিক কার্ডের ছ'টা গোল জানলার (মানে ফুটোর) মধ্যে শুধু একটার ভেতর দিয়ে একটা সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। এবার আরেকটা সংখ্যা-কার্ড নিয়ে তার ওপর ম্যাজিক কার্ডটা ধরো। এবারেও দেখবে ম্যাজিক কার্ডের মধ্যে শুধু একটা জানলা দিয়ে আরেকটা সংখ্যা চোখে পড়ছে। এই ভাবে একে একে ছ'টা সংখ্যা কার্ডকে নিয়েই যদি আলাদা আলাদা ভাবে ম্যাজিক-কার্ডের তলায় রেখে পরীক্ষা করো তাহলে দেখবে ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ও ৩২—সবসুদ্ধ এই ছ'টা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ। ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ও ৩২—এই ছ'টা সংখ্যার একটা নাম দেওয়া যাক্ এবার—উৎপাদক সংখ্যা। কেন উৎপাদক সংখ্যা নাম দিচ্ছি একটু পরেই বুঝতে পারবে। এতক্ষণে দেখেছ নিশ্চয় যে প্রত্যেক সংখ্যা-কার্ডে বিশেষ একটি উৎপাদক সংখ্যা আছে। এবার একটার বদলে দু'টো সংখ্যা-কার্ড নিয়ে তার ওপরে ম্যাজিক কার্ডটা চড়াও। ম্যাজিক কার্ডের দুটো জানলা দিয়ে দু'টো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে, তাই না? তাছাড়া দুটো সংখ্যাই উৎপাদক সংখ্যা। ১, ২ ৪, ৮, ১৬ ও ৩২-এর মধ্যে কোন্ সংখ্যা দুটো দেখা যাবে সেটা নির্ভর করবে কোন্ কোন্ সংখ্যা-কার্ড নেওয়া হয়েছে তার ওপর! তবে ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ও ৩২-এর মধ্যেই যে-কোনো দুটো সংখ্যা হবে।

এবার খেলার নিয়মের কথাটা মনে করিয়ে দিই আরেকবার। ১ থেকে ৬৩-এর মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা মনে মনে ভেবে নিতে হবে। তারপর যে-যে সংখ্যা-কার্ডে ওই বিশেষ সংখ্যাটি আছে, সেই কার্ড বা কার্ডগুলিকে এক জায়গায় জড় করতে হবে। তারপর সংখ্যা-কার্ড বা কার্ডগুলোর মাথায় ম্যাজিক কার্ড চড়িয়ে দেখে নিতে হবে কার্ডের জানলা দিয়ে কোন্ কোন্ সংখ্যা উঁকি মারছে। সেই সংখ্যা কটা যোগ দিলেই মনে মনে ভেবে রাখা সংখ্যাটা বেরিয়ে পড়বে।

ধরো কেউ মনে মনে সাত ধরেছে। সংখ্যা-কার্ড গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে দ্যাখো তিনটে মাত্র কার্ডে ৭ সংখ্যাটা আছে। এবং এই তিনটে কার্ডের ওপর ম্যাজিক কার্ডটা ধরলে তিনটে জানলা গলে তিনটি উৎপাদক সংখ্যা—১, ২ ও ৪ ফুটে বেরোচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দিই—ধরো, কেউ মনে মনে ১৬ ধরেছে। খুঁজে দ্যাখো ১৬ সংখ্যাটা আছে শুধু একটি মাত্র সংখ্যা-কার্ডে আর সেই কার্ডটার ওপর ম্যাজিক কার্ড ধরলেই উৎপাদক সংখ্যা ১৬ চোখে পড়ছে।

এখন একটু একটু বুঝতে পারছ নিশ্চয় কেন ১, ২ ৪, ৮, ১৬ ও ৩২ এই ছ'টি সংখ্যাকে উৎপাদক সংখ্যা বলেছি। এই ছ'টি উৎপাদক সংখ্যার যে-কোন একটি বা একাধিক যোগ করে ১ থেকে ৬৩ অবধি যে-কোন সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন ১ পাওয়া যায় উৎপাদক সংখ্যা ১ লেখা একটি কার্ড থেকে, ২ পাওয়া যায় উৎপাদক সংখ্যা ২ লেখা একটি কার্ড থেকে, ৩ পাওয়া যায় উৎপাদক সংখ্যা ২ ও উৎপাদক সংখ্যা ১ লেখা দুটি কার্ড একসঙ্গে রাখলে, ৪ পাওয়া যায় উৎপাদক সংখ্যা ৪ লেখা একটি কার্ড থেকে ইত্যাদি। ৬৩ পেতে হলে ছটি উৎপাদক সংখ্যা লেখা ছটি সংখ্যা-কার্ডই একজায়গায় জড় করতে হবে।

প্রত্যেকটা সংখ্যা-কার্ডে একটা করে উৎপাদক সংখ্যা আছে বলেছি। কিন্তু অন্য সংখ্যাগুলো কিভাবে লেখা হয়েছে, সেটা বলা হয়নি। এটা পরিষ্কার যে ১ সংখ্যাটি শুধু এই একটা কার্ডেই থাকতে পারে। কিন্তু ২ সংখ্যাটা কি এই কার্ডে থাকবে? না। কারণ ২ আরেকটা উৎপাদক সংখ্যা এবং ওই উৎপাদক সংখ্যা লেখা আরেকটা কার্ড আছে। (ছ'টি উৎপাদক সংখ্যার প্রত্যেকটি কেবল

একটি ক'রে কার্ডে আছে) এবার ৩-এর বেলায় কি হয় দেখা যাক। ৩ পেতে হলে উৎপাদক ১-এর সঙ্গে উৎপাদক ২ যোগ করতে হবে। কাজেই ৩ সংখ্যাটা উৎপাদক ১ লেখা সংখ্যা-কার্ডেও যেমন থাকবে তেমনি থাকবে উৎপাদক ২-লেখা কার্ডটাতেও। একই ভাবে লিখতে পারি—

সংখ্যা ৪ থাকবে উৎপাদক ৪ লেখা কার্ডে।
সংখ্যা ৫ থাকবে উৎপাদক ৪ ও
উৎপাদক ১ লেখা কার্ড দুটোয়।
সংখ্যা ৬ থাকবে উৎপাদক ৪ ও
উৎপাদক ২ লেখা কার্ড দুটোয়।
সংখ্যা ৭ থাকবে উৎপাদক ৪ ও
উৎপাদক ২ ও উৎপাদক ১ লেখা কার্ড তিনটেয়।
সংখ্যা ৬৩ থাকবে উৎপাদক ৩২, ১৬, ৮, ৪, ২, ও ১ লেখা ছ'টা কার্ডেই।

এইভাবে ১ থেকে ৬৩ অবধি প্রতিটি সংখ্যা নিয়ে দেখতে হবে তার মধ্যে কোন্‌টি কোন্ উৎপাদক সংখ্যা বা কোন্ কোন্ উৎপাদক সংখ্যা যোগ করে পাওয়া যায় এবং সেই অনুসারে সেই-সেই উৎপাদক সংখ্যা-ওলা সংখ্যা-কার্ডটায় ওই সংখ্যাটা লিখে রাখতে হবে।

এবার সংখ্যা ও ম্যাজিক কার্ডের জানলা বা ফুটোগুলোর কথা বলি। ম্যাজিক-কার্ডের ছ'টা জানলা আছে আর প্রত্যেকটা সংখ্যা কার্ডে পাঁচটা ক'রে জানলা আছে। যে-কোনো একটা সংখ্যা-কার্ডের ওপর ম্যাজিক-কার্ডটা বসালে দেখা যাবে সংখ্যা-কার্ডের পাঁচটা জানলা ম্যাজিক কার্ডের পাঁচটা জানলার ঠিক ওপর-ওপর বসেছে, তার মানে এপার-ওপার দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। শুধু ম্যাজিক কার্ডের একটা জানলা দিয়ে সংখ্যা-কার্ডের উৎপাদক সংখ্যাটা চোখে পড়ছে। এবার আরেকটা সংখ্যা-কার্ড নিয়ে আগেরটার পিছনে রেখে, কার্ড দুটোর ওপর ম্যাজিক-কার্ড চাপা দাও। এখন দেখা যাবে ম্যাজিক কার্ডের আরেকটা জানলা দিয়ে দ্বিতীয় কার্ডের উৎপাদক সংখ্যাটাও চোখে পড়ছে। এইভাবে ছ'টা সংখ্যা-কার্ড একজোট করে ম্যাজিক কার্ড চাপালে দেখা যাবে ছ'টা উৎপাদক সংখ্যা উঁকি মারছে ছ'টা জানলা দিয়ে। ম্যাজিক কার্ডের ঠিক যে-যে অংশে জানলাগুলো আছে প্রত্যেকটি সংখ্যা-কার্ডেরও ঠিক সেই সেই অংশে পাঁচটা জানলা ও একটা উৎপাদক সংখ্যা আছে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় যে, ছ'টা সংখ্যা কার্ডে ছ'টা উৎপাদক সংখ্যার প্রত্যেকটাই আছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। না হলে, একটা উৎপাদক সংখ্যার পিছনে আরেকটা চাপা পড়ে যাবে এবং জানলা গলে সেটাকে দেখা যাবে না। তাছাড়া ছ'টা জানলার অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে এক-একটা সংখ্যা-কার্ডের এক জায়গায় উৎপাদক সংখ্যা আছে বলেই সংখ্যা-কার্ডগুলো আগুপিছু করে সাজালেও সব সময়েই একই ফল পাওয়া যায়।

এতক্ষণে তোমরা ম্যাজিক কার্ডের খেলা তৈরির কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছ ধরে নিচ্ছি। তবে উৎপাদক সংখ্যা-গুলো সম্বন্ধে আরেকটা খবর জেনে রাখা দরকার। আমরা সাধারণতঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ০—এই দশটি অঙ্কের সাহায্যে যে-কোন সংখ্যা লিখি। কিন্তু দশটি অঙ্কের বদলে শুধু শূন্য ও এক (বা যে কোনো দুটি সংকেত, চিহ্ন বা অঙ্ক) ব্যবহার করেও যে-কোনো সংখ্যা লেখা সম্ভব। ০ ও ১ ব্যবহার করে সংখ্যা লেখার পদ্ধতিকে বলা হয় বাইনারি পদ্ধতি। ধরো, ৯ এই সংখ্যাটাকে বাইনারি পদ্ধতিতে আমরা লিখব। প্রথমেই ৯কে ২ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হল ৪ আর ভাগ-শেষ ১। এই ভাগশেষ ১ হল বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা ৯-এর একক স্থানের অঙ্ক। এবার ভাগফল ৪কে আবার দুই দিয়ে ভাগ। ভাগফল হল—২, ভাগশেষ—০। তার মানে বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা ৯-এর দশক স্থানের অঙ্ক হল এই ভাগশেষ, অর্থাৎ ০। আবার ভাগফল ২ কে ভাগ দাও ২ দিয়ে। এবার ভাগফল হল ১ আর বাইনারি পদ্ধতির শতক স্থানের অঙ্ক হল ভাগশেষ ০। আবার ভাগফল ১কে ভাগ দাও ২ দিয়ে। ১-এর মধ্যে ২ যায় না তাই এবার ভাগফল হল ০ আর ভাগশেষ ১ হল বাইনারি পদ্ধতির সহস্র স্থানের অঙ্ক। তার মানে বাইনারি পদ্ধতিতে ৯ লেখা হবে এইভাবে—

স	শ	দ	এ
১	০	০	১

এবার লক্ষ্য করো ৯ এই সংখ্যাটা উৎপাদক সংখ্যা ৮ ও ১ যোগ করে পাওয়া যায়। ১ সংখ্যাটাকে আমরা $২^{০}$ হিসাবে এবং ৮ সংখ্যাটাকে আমরা $২^{৩}$ হিসাবে লিখতে পারি। (যে কোন সংখ্যার ০ ঘাত = ১) এবার লক্ষ্য করো বাইনারি সংখ্যার এককের ও সহস্রের ঘরে শুধু ১ আছে। তার মানে এই দুটি ঘরের উৎপাদক সংখ্যাই হচ্ছে যথাক্রমে ১ ও ৮। অন্য দুটি ঘর অর্থাৎ দশক ও শতকের ঘরে শূন্য আছে তার মানে ৯ সংখ্যাটি পাওয়ার জন্য এই দুটি ঘরের উৎপাদক সংখ্যাগুলি যোগ করার দরকার নেই।

স	শ	দ	এ
৮+	০+	০+	১=৯
$২^{৩}$+	০+	০+	$২^{০}$=৯
১+	০+	০+	১ =১০০১

ছ'টি উৎপাদক সংখ্যা ৩২, ১৬, ৮, ৪, ২, ও ১ কে আমরা যথাক্রমে এইভাবেও লিখতে পারি—$২^{৫}$, $২^{৪}$ $২^{৩}$, $২^{২}$, $২^{১}$ ও $২^{০}$। তার মানে বাইনারি সংখ্যার একক ঘরের উৎপাদক সংখ্যা ১, দশকের ঘরের উৎপাদক সংখ্যা ২, শতকের ঘরের উৎপাদক সংখ্যা ৪, সহস্রের ঘরের ৮ অযুতের ঘরের ১৬ ও লক্ষের ঘরের ৩২। এই ছ'টি উৎপাদক সংখ্যা দিয়ে আমরা ১ থেকে ৬৩ অবধি যে কোন সংখ্যা লিখতে পারি কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, বাইনারি পদ্ধতিতে ছ' অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে আমরা ১ থেকে ৬৩ অবধি যে-কোন সংখ্যা লিখতে পারি। এই কারণেই ছ'টি সংখ্যা কার্ডের (উৎপাদক সংখ্যা পিছু একটি) সাহায্যে ১ থেকে ৬৩-এর বেশি সংখ্যার খেলা দেখান সম্ভব নয়। কিন্তু সাতটি ম্যাজিক কার্ড নিয়ে খেলা তৈরি করলে সেখানে আমরা সাতটা উৎপাদক সংখ্যা পাব—

তার মানে আমরা এখানে ১ থেকে ১২৭ অবধি যে কোনো সংখ্যা বাইনারি পদ্ধতিতে লিখতে পারব বা ১ থেকে ১২৭ অবধি সংখ্যা নিয়ে ম্যাজিকের খেলা দেখাতে পারব। সংখ্যা-কার্ডের সংখ্যা যত বাড়ানো যাবে ততই বেশী সংখ্যা নিয়ে ম্যাজিক দেখানো যাবে। তবে সংখ্যা-কার্ডের সংখ্যা যত হবে, ম্যাজিক কার্ডের জানলার সংখ্যাও হবে ঠিক ততই।

একটা কথা জানিয়ে রাখি। মার্টিন গার্ডনারের একটি লেখা পড়ে এই ম্যাজিক কার্ড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

কার্ডের নম্বর	বাইনারি বা উৎপাদক সংখ্যা
১ম কার্ড	$২^{০}$ অথবা ১
২য় কার্ড	$২^{১}$ অথবা ২
৩য় কার্ড	$২^{২}$ অথবা ৪
৪র্থ কার্ড	$২^{৩}$ অথবা ৮
৫ম কার্ড	$২^{৪}$ অথবা ১৬
৬ষ্ঠ কার্ড	$২^{৫}$ অথবা ৩২
৭ম কার্ড	$২^{৬}$ অথবা ৬৪

মোট = ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩২ + ৬৪ = ১২৭

ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের অনেক চিঠি পেয়েছি এ-সম্বন্ধে। অনেকের ম্যাজিক কার্ডগুলো নাকি নষ্ট হয়ে গেছে কিম্বা ছাপা ও পাঞ্চিঙের দোষে খেলা দেখাতে অসুবিধে হচ্ছে। তোমাদের সুবিধার জন্যে এই সংখ্যার পিছনের প্রচ্ছদে সবকটা ম্যাজিক ও সংখ্যা-কার্ড একসঙ্গে ছেপে দেওয়া হল। একটা স্কেল ও ব্লেড্ নিয়ে যত্ন করে ডট্—ডট্ লাইন বরাবর তোমরা যদি ৭টা কার্ড কেটে বার করে নাও আর জানলাগুলো (যে-যে সাদা খোপে কোনো সংখ্যা ছাপা নেই) ফুটো করে নাও—তাহলেই আরেক সেট্ ম্যাজিক কার্ড পেয়ে যাবে।

নিজে কর : টেলিগ্রাফ

জয়দেব বসাক

তোমরা কিভাবে টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করবে ?

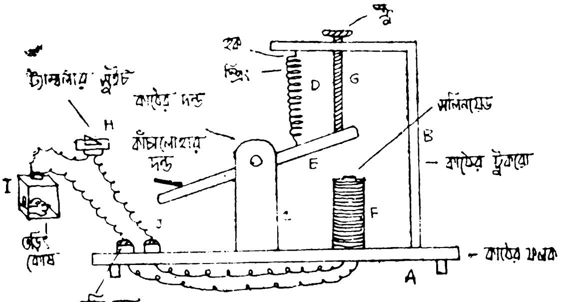

(1) কাঠের ফলক—15c.m. × 12c.m — একটা। (2) কাঠের টুকরা (L আকৃতির)—দৈর্ঘ্য 9c.m. ও 7c.m, প্রস্থ $1\frac{1}{2}$c.m. বেধ 1c.m.—একটা (3) কাঠের দণ্ড—$\frac{1}{2}$c.m. × 1c.m. × 7c.m দুটো (4) ধাতব স্প্রিং—দৈর্ঘ্য 3c.m.—একটা (5) লোহার দণ্ড—$\frac{1}{2}$c.m. × 1c.m. × 9c.m.—একটা। (6) কাঁচা লোহার দণ্ড অন্তরিত তামার তার জড়ানো (সলিনয়েড)—2c.m × 2c.m × 4c.m. একটা। (7) ছোট ধাতব হুক—দুটো (8) পিতলের স্ক্রু—একটা। (9) ট্যাম্বলার সুইচ—একটা (10) তড়িৎ কোষ—1·5 volt—দুটো (11) তামার তার—60c.m. (12) তড়িৎ দ্বার—দুটো

প্রথমে A কাঠের ফলকের এক প্রান্তে B কাঠের টুকরা ছবির মতো লাগাও। এখন G স্ক্রুটি B কাঠের টুকরার উপরের কাঠের মাঝখানে ফুটো করে আটকাও। এরপর F সলিনয়েড দণ্ডটি B থেকে 4c,m. দূরে লাগাও। C কাঠের দণ্ড দুটোর উপরে একটা করে ফুটো করে B থেকে 10c.m. দূরে লাগাও। এবার E কাঁচালোহার দণ্ডের দুদিকে দুটো ছোটো পেরেক আর একটা হুক ওপর দিকে স্ক্রুতে লাগা প্রান্ত থেকে 2.cm দূরে ঝালাই কর। তারপর B কাঠের টুকরা উপরের প্রান্তে একটা লাগাও। এবার দুটো হুকের সাথে স্প্রিংটা আটকে E কাঁচা লোহার দণ্ডের পেরেক দুটো C কাঠের দণ্ডের ওপরের ফুটো দুটোতে আটকে দাও। এখন A কাঠের ফলকের যে প্রান্তে B কাঠের টুকরা আছে তার বিপরীত প্রান্তে J দুটো তড়িৎদ্বার লাগাও। এখন দুটো তড়িৎদ্বার থেকে দুটো তার সলিনয়েড দণ্ডের তারের দুপ্রান্তে যুক্ত কর। এরপর J তড়িৎদ্বার থেকে অপরদিকের দুটো তারের একটা I তড়িৎ কোষের এক মেরু সঙ্গে এবং অপর তারটা H ট্যাম্বলার সুইচের এক দ্বারের সঙ্গে যুক্ত কর ও অপর দ্বারের তার I তড়িৎ কোষের অপর মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর। এখন সুইচ একটু টিপেই ছেড়ে দিলে হ্রস্ব শব্দ বা 'টরে' অর্থাৎ 'ডট' উৎপন্ন হবে। আবার সুইচ টিপে কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দিলে দীর্ঘ 'টক্কা অর্থাৎ ড্যাশ' উৎপন্ন হবে।

মিনি শাট্‌ল্‌—'চ্যালেঞ্জার'

অমিতাভ সেন

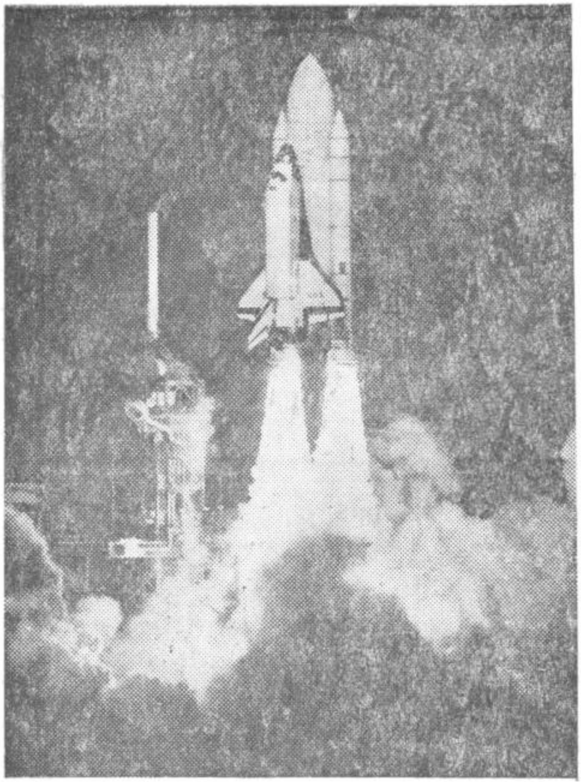

মহাকাশ-ফেরি বা স্পেশ-শাট্‌ল্‌ 'কলম্বিয়া ইতিমধ্যে কঠিন পরীক্ষায় উত্‌রে গেছে। এর আগে কিন্তু রকেট ছাড়া মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবং সেই রকেট মাত্র একবার ব্যবহার করা যেত। মহাকাশ-ফেরি কলম্বিয়া বারবার ব্যবহার করার মতো করেই তৈরি। গত ২৭শে জুন কেপ্‌ ক্যানাভেরাল থেকে চতুর্থ বার পাড়ি দিয়েছে 'কলম্বিয়া' কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সাফল্যে মন খুলে সাড়া দিতে পারেনি। কারণ আর কিছুই নয়। জানা গেছে 'কলম্বিয়া'-কে সামরিক কাজে লাগানোর জন্যই এই মহড়া। কলম্বিয়ার পর এবার জল্পনা-কল্পনা মিনি শাট্‌ল্‌ চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে।

আমেরিকার সামরিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইতিমধ্যেই এই মিনি-শাট্‌ল্‌ তৈরি করে ফেলেছে। আকারে এটি কলম্বিয়ার দশ ভাগের এক ভাগ। তৈরি করতে খরচও কম। তাছাড়া বারবার ব্যবহার করার জন্য তৈরি এই মহাকাশযানটি আমেরিকার সামরিক বিমান বাহিনীর যে কোন ঘাঁটি থেকে ক্ষেপণ করা সম্ভব। এটিকে চালনা করার জন্য পাইলট লাগবেনা। পৃথিবীর ভূভাগের ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার উঁচুতে এটি প্রায় তিন টনের মতো মাল বহন করতে পারবে। একটি বিশেষ ভাবে নির্মিত বোয়িং ৭৪৭ বিমান এই মহাকাশ-যান ও তার জ্বালানী-ভরা ট্যাঙ্কটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাবে। বোয়িং ৭৪৭-এ ঠাসা থাকবে ট্যাঙ্ক ভর্তি তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন জ্বালানী। তাছাড়া বিমানটির লেজে আটকানো থাকবে একটি বিশেষভাবে নির্মিত রকেট। এই রকেটের সাহায্যেই স্পেশ শাট্‌ল্‌ বোঝাই বোয়িং-৭৪৭ ষাট ডিগ্রি কোণে মাটি ছেড়ে আকাশের ওপর ১৩০০০ মিটার উচ্চতায় উঠে যাবে। তারপর চ্যালেঞ্জার তার নিজস্ব রকেট ছুঁড়ে কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করবে।

বাঁ দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্পেশ শাট্‌ল্‌ কলম্বিয়ার দৌড় শুরু হচ্ছে ফ্লোরিডার কেপ্‌ ক্যানাভেরাল্‌ থেকে। বিমানের মতো আকৃতির কলম্বিয়ার পিছনে যেটা রকেটের মতো দেখাচ্ছে সেটা আসলে জ্বালানী রাখার ট্যাঙ্ক। কলম্বিয়াকে কক্ষে পৌঁছে দিয়ে জ্বালানীর ট্যাঙ্কটা খসে পড়বে এবং সেটাকে উদ্ধার করে আবার ব্যবহার করা যাবে।

নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে মিনি-শাট্‌ল্‌ 'চ্যালেঞ্জার' বোয়িং-৭৪৭-এর পিঠে চড়ে রওনা হয়েছে।

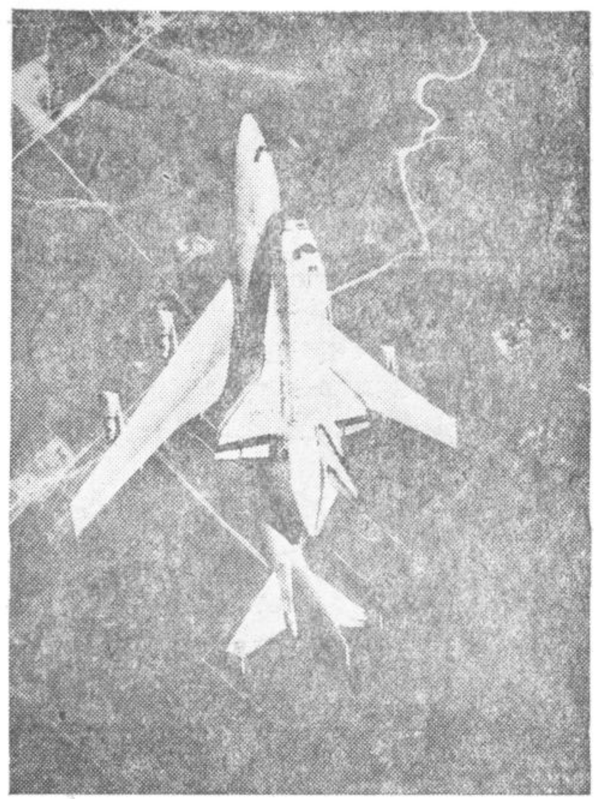

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
কীসের এতো দাপাদাপি — ভূমিকম্প যেন!
হৈ! হৈ!
রৈ! রৈ!
ভূমিকম্প কী মা?
ওকেই জিজ্ঞেস কর।
ভূমিকম্প? ভূমি মানে মাটি, আর—
কম্প মানে কাঁপা। অর্থাৎ মাটি কাঁপা, — এই তো?
ঠিক তাই!
কিন্তু মাটি কাঁপে কেন সেইটে বোঝাও!
পৃথিবীর কেন্দ্রে নানা পদার্থ ফুটছে, মাঝে মাঝে তার বাষ্প বা গ্যাস ওপরে বেরিয়ে আসতে ধাক্কা দেয়, আবার—
আবার কী?
কেউ বলে, মাটির নীচে শিলাস্তর ভেঙে স্থানচ্যুত হয়, তাই মাটি কাঁপে, ফেটেও যায়, ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ হয়।
লোকজন বহু হয় হতাহত।
ঠিক।

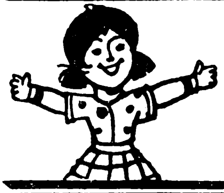

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সেপ্টেম্বর '৮২ সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা : মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, অরূপকুমার পাল, মিতা মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, রমা মণ্ডল, শুভাশিষ আতর্থী, পরিচয় সান্যাল, শংকর বিশ্বাফ, দেবব্রত বিশ্বাস, সুগোপা চক্রবর্তী, অভিজিৎ দত্ত, অরূপ দে, ইন্দ্রনীল ঘোষ, প্রবীর ভট্টাচার্য্য, অলোক রায়চৌধুরী, প্রণবকুমার সরকার, পুলক দাস, অনিন্দ্য বটব্যাল, শুভ্রনীল ঘোষাল, অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, সেক নজরে হোসেন, শ্যামল বণিক, নবকমল বণিক, কাজরী মজুমদার, শবরী মজুমদার, বিশ্বজিৎ সরকার, রাজীব সামন্ত।

২৪-পরগণা : সুপ্রিয় পুরকায়স্থ, তমাল ঘটক, সৌমিত্র মজুমদার, বিপ্লব ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সৌমেন্দ্রনাথ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পারুল মজুমদার, বিনয় ভট্টাচার্য, স্মৃতিকণা কর, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, সুগত দত্ত, সমীরণ বিশ্বাস, তাপস ঘোষ, সৌমিত্র বিশ্বাস, সমীর মজুমদার, দেবাশিস ভট্টাচার্য।

হাওড়া : প্রণবকুমার পাল, তপনকুমার ঘাঁটা, তরুণকুমার ঘোষ, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু খাঁ, কল্যাণকুমার পাত্র, অভিজিৎ রায়, রমা চক্রবর্তী, কাঞ্চন কাঞ্জিলাল, তীর্থঙ্কর পাইন, অভিজিৎ সরকার, অসিত রীত, অশোককুমার সামন্ত।

হুগলী : শিবনাথ খাঁ, প্রশান্তকুমার প্রামাণিক, নিমাইচন্দ্র সার, দেবাশিস সাহা, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা চন্দ্র, শমিত পাল, নন্দিনী দত্ত, আব্দুল নাইম, কিংশুক মিত্র, বনমালী প্রামাণিক, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী, অমল জানা, প্রদীপকুমার রায়, দেবাশীষ চক্রবর্তী, সুশান্তকুমার পাড়ুই, চয়নিকা সান্যাল, আশীস চ্যাটার্জী, তাপসকুমার সাধুখাঁ, বনমালী প্রামাণিক, সেখ আবুল ফজল, অভিজিৎ রায়, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, সৌরভ সরকার।

বর্ধমান : জয়কুমার দে, সুরজিৎকুমার কুণ্ডু, বাপী কুমার, পার্থ চক্রবর্তী, আরতি মণ্ডল, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সমীরণ মহাপাত্র, কৃষ্ণ সেন, দিলীপ গোস্বামী, বাবলু হালদার, গৌতমকুমার বিট, সুবিমল ভট্টাচার্য, নেপালচন্দ্র ঘোষ, দিলীপকুমার কুণ্ডু, ফাল্গুনী দাস, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, অমিত চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমাদ্রি দাশ, দেবতনু ভট্টাচার্য, শান্তনু দাঁ, তপনকুমার রায়, সোমা দাশ, তপতী হাজরা, অনুভা হাজরা, অলকা হাজরা, গীতাঞ্জলি নন্দী, জগবন্ধু হাজরা, উদয়কুমার হাজরা, সৌরিশ হাজরা, কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমীর ধারা, গৌতম সাহা, সব্যসাচী রায়, রিমা বিশ্বাস, সোমা মুন্সী, সঞ্জীবকুমার ব্যানার্জী, উৎপল দত্ত, জ্যোতিপ্রকাশ দাস, সোমেশ ব্যানার্জী, সৈয়দ আব্দুল ওয়াসেক, তাপস সরকার, তরুণকুমার সিংহ, নন্দিতা সিংহ, অরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, সুকুমার ঘোষ, সুচিত্রা গোস্বামী।

মেদিনীপুর : চিন্ময় সিংহ, হিমাদ্রি পাল, মাগাৎচন্দ্র মুর্মু, রতনকুমার বাড়ৈ, বিন্দু বিশ্বাস, স্বপনকুমার বাড়ৈ, শোভেন দানা, হাবিবুর রহমান, সুজাতা প্রামাণিক, গৌতম ভুঞা, সুজিতকুমার দাস, চন্দন দাস, সিতাংশু আচার্য, কানাইলাল সাউ, বিকাশ বিশ্বাস, অমিয় বিশ্বাস, তুষারকান্তি পাল, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শতদ্রু সাহা, অনিমেশ সামন্ত, অশোককুমার রাজ, বিশ্বরঞ্জন বেরা, সুব্রতকুমার সাউ, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, অনিমেষ সামন্ত, নিরূপম সামন্ত, অরুণকুমার পাল, তিমিরবরণ মাহাত, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, নির্মলকুমার সিংহ, পঙ্কজ দত্তচৌধুরী, কাবেরীরানী পান, প্রদীপকুমার পাড়ী, বিশ্বনাথ দে, শান্তনু সাহা, চন্দনকুমার পাপি, রঞ্জনকুমার পাপি, কঙ্কনকুমার পাপি, সেক কামরে হোসেন।

নদীয়া : মনোজ আগরওয়ালা, সুশান্ত কুমার কবিরাজ, শ্যামল বিশ্বাস, স্নেহশীষ চ্যাটার্জী, রিক্তা চ্যাটার্জী, পীযুষ কান্তি মণ্ডল, পল্লব মোহান্ত, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, হাবুল চন্দ্র রায়, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা, দেবাশীষ কুণ্ডু।

বীরভূম : আতা উল্লাহ্, চন্দ্রনাথ মণ্ডল, উমাশঙ্কর রায়, পবিত্রকুমার সিংহ, পার্থ ভট্টাচার্য্য।

বাঁকুড়া : সৌমেন মণ্ডল, রমেণ মণ্ডল, কাজল মণ্ডল, রঞ্জিত মণ্ডল, সুজয় সাম, সুমন সাম, অঞ্জন বিশ্বাস, অনুপ বিশ্বাস, শুভ্রা বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, বিনয় পাল, নীলাদ্রি চ্যাটার্জী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দু সেন, রূপম কবিরাজ, রাজর্ষি রায়, কৃষ্ণেন্দু শোভন সেন।

মালদহ : তরুণকান্তি বিশ্বাস, অনাদি বিশ্বাস, শঙ্কর বিশ্বাস, মৃন্ময় পাল, স্বপন কর্মকার, চিন্ময় ঝাঁ, দেবদুলাল ঝাঁ, কেয়া চৌধুরী, দেবাশীষ শেঠ, সুরমা ঘোষ, জয়ন্ত চ্যাটার্জী, চিন্ময় পাল, প্রবাল মিত্র, প্রদ্যুম্ন মিত্র।

মুর্শিদাবাদ : অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য, অয়ন ভট্টাচার্য্য, মুক্তিপদ দাস, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত রায়, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত সঞ্জীব সরকার, বাদল মণ্ডল, দেবাশিষ বিশ্বাস, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, দেবজিৎ মণ্ডল।

পঃ দিনাজপুর : শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়, কিংশুক সরকার, সঞ্জয় সাহা, গৌতম ঘোষ, নৃপেন চন্দ্র পাল।

কোচবিহার : উত্তমকুমার পাটোয়ারী, দেবচন্দ্র দেবনাথ, উৎপল দত্ত, দীপক কর্জী, জয়ন্ত বোস, দেবযানী বোস, পম্পাশ্রী বোস, কৃষ্ণকান্ত বর্মণ, মলয় রায়, দীননাথ রায়, সত্যেন অধিকারী, মলয় রায়, বাসবী কর্মকার।

জলপাইগুড়ি : মিণ্টু পাল, জয়জিৎ লাহিড়ী, সুমিতা-নাগ নন্দিনী ভট্টাচার্য্য, অসীম গোস্বামী, মনোহর প্রসাদ গুপ্তা, সন্দীপন মুখোপাধ্যায়, মনসিজ মুখোপাধ্যায়।

দার্জিলিং : রাজীব চ্যাটার্জী, অসিত রায়, পার্থপ্রতিম বোস।

আসাম : ডিব্রুগড় ।। অপু দাস, উৎপল চন্দ্র দত্ত, অনির্বান দত্ত, জয়দীপ কর, লিপিকা কর্মকার, বাবুল কর্মকার শুভংকর ভট্টাচার্য্য, মনসাচরণ ভট্টাচার্য্য, অমল পাল, ভম্পা পাল, উজ্জ্বল দাস, রাহুল দাস, রজত দাস, রাজেশ কুমার গুপ্ত, দীপ্তি কর, অনুপ দেব, সমর নন্দী, সুধীর পাল, পার্থ-প্রতীম দাস, সুপ্রতীক পাত্র, শ্যামল কুমার সরকার, জয়দীপ নন্দী, শান্তনু দত্ত, বিষ্ণুগোপাল দাস, প্রদীপ কর্মকার, মিণ্টু মণ্ডল, রিঙ্কু সরকার, অমিতা দে, মনোজ কুমার দাস, রাজেশ গুপ্ত, সাধন চন্দ্র দত্ত, শমীক গঙ্গোপাধ্যায়, সুরজিৎ মল্লিক চৌধুরী, চুনীলাল পাল, রাজা চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ-কুমার পাইক, অরূপ কর, কৌসিক পুরকায়স্থ, সুজিত কুমার পাল, ডালিমকুমার ভৌমিক, সমীর দত্ত, মনোজিৎ দাস, গৌতম দেও, সুব্রত সেন, রমেন ভৌমিক, সুব্রত কুমার বিশ্বাস, সুদীপ চক্রবর্তী, সুপ্রিয় কুমার দেব, দেবব্রত দস্তিদার পবিত্র পাল, শান্তনু রায়, রাজু দেব, রাহুল গুপ্ত, সমর নন্দী, পবিত্র পাল, সুবীর দাস, সুরজিৎ মল্লিক চৌধুরী, সুরজিৎ কর্মকার, পৃথ্বীশ পুরকায়স্থ, সঞ্জীব কুমার গাঙ্গুলী, কলি চক্রবর্তী সুজাতা চক্রবর্তী, তপন কুমার বড়ুয়া, পার্থ দে।

আসাম : লামডিং ।। রিজু বরা।

ডিগবয় : সুখেন্দু বণিক।

ত্রিপুরা : ধর্মনগর : সৌমিত্র পাল।

বিহার : পূর্ণিয়া : পার্থসারথি রায়, পারমিতা রায়।
কাটিহার : বৈদূর্যময় মিত্র।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
অমরনাথ রায়ের

সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫.০০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫.০০

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের

পশুপাখী কীটপতঙ্গ ৮.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ।। ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

১। নীলা, চুনী আর চীনামাটি একই ধাতুর বিভিন্ন যৌগ। এই অদ্ভুত ধাতুটি কি?

২। আঠারো ক্যারাট সোনার গহনায় শতকরা কতো ভাগ সোনা থাকে?

৩। রং তৈরি করতে কোন ধাতুর অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়?

৪। অ্যালুমিনিয়াম, রূপা ও তামার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে ভাল তড়িৎপরিবাহী?

৫। চুনীর লাল রং আর পান্নার সবুজ রং হয় একটি বিশেষ ধাতুর উপস্থিতির জন্য। ঐ ধাতুটি কি?

৬। তামা, রূপা, সীসা ও সোনার মধ্যে কোন্‌ ধাতুটি সবচেয়ে বেশী নমনীয়?

৭। মাধ্যমের উষ্ণতা বাড়লে শব্দের বেগ বাড়ে না কমে?

৮। প্রেসার কুকারে জলের উষ্ণতা তার স্বাভাবিক স্ফুটনাংকের চেয়ে বেশী না কম থাকে?

৯। কোন্‌ মাধ্যমে সব রঙের আলো সমান বেগে চলে?

১০। তাপে কোন বস্তু গলতে আরম্ভ করলে তার উষ্ণতা গলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকে কেন?

১১। কোন্‌ উদ্ভিদ হর্মোন প্রয়োগ অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়?

১২। সোডিয়াম অ্যাসিটেট কোন্‌ শ্রেণীর লবণ?

১৩। লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে কোন্‌টির বেশী প্রতিসরণ হয়?

১৪। কোন্‌ উদ্ভিদের কাণ্ড সবুজ, চ্যাপ্টা, পুরু, রসাল এবং সূক্ষ্ম কাঁটায় পরিপূর্ণ?

১৫। কোন্‌ উদ্ভিদকে ইংরেজীতে 'লুকিং গ্লাস ট্রি' নামে অভিহিত করা হয়?

১৬। উদ্ভিদ দেহে কোন স্নায়ুতন্ত্র আছে কি?

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

(উত্তর থাকবে পরবর্তী সংখ্যায়)

সেপ্টেম্বর সংখ্যার শব্দ সন্ধানের সমাধান

(অনুরাধা রায়)

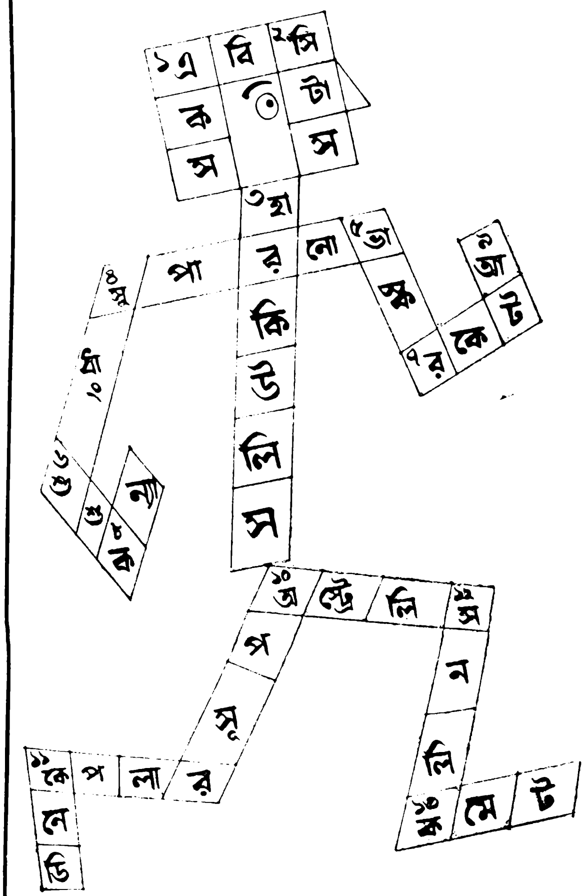

(সেপ্টেম্বর '৮২ সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। না, তামা চৌম্বক পদার্থ নয়। ২। জন ডালটন। ৩। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'মার্জেনথেলার' 1885 খ্রীষ্টাব্দে লাইনোটাইপ আবিষ্কার করেন। ৪। বার্জেলিয়াস সেলেনিয়াম ও থোরিয়াম নামক মৌল দু'টি আবিষ্কার করেন। ৫। 'লুনার কস্টিক' হলো সিলভার নাইট্রেট ($AgNo_3$) যৌগের অপর নাম। ৬। গামা রশ্মি। ৭। নিউটন $= 10^5$ ডাইন। ৮। 72টি প্রোটন থাকে। ৯। অসদ্‌বিম্ব। ১০। গ্রাফাইট। ১১। ক্যারোটিন। ১২। এগারো সেকেণ্ড। ১৩। 13। ১৪। এক বীজযুক্ত ফল। ১৫। 4R অর্থাৎ মূল রোধের চারগুণ বেশী হবে। ১৬। মনুষ্য দেহে 'অ্যাপেনডিক্স' সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় অংশ।

আবদুল কাকার অঙ্ক

মানসী দাস

আবদুল কাকার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। আবদুল কাকা ছিল যেমনি বেঁটে, তেমনি তার মাথায় ছিল মস্ত বড় টাক্। আর থুতনিতে এক গোছা দাড়ি। তা বয়স হবে প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। কিন্তু সে জানতো শুধু দুই পর্যন্ত গুণতে। দুই পর্যন্ত গুণতে জানলে কি হবে সে ছিল ভীষণ চালাক।

কিন্তু এই বুড়ো বয়সেও আবদুল কাকা প্রচণ্ড গুলি খেলতে ভালবাসে। পাড়ায় যত ছোট ছোট ছেলে আছে তাদের সঙ্গে প্রায় সবসময়ই আবদুল কাকাকে গুলি খেলতে দেখা যায়। একবার হলো কি, আবদুল কাকার কাছে সেদিন ১৭ খানা গুলি ছিল। আমাদের পাড়ার ১৩-১৪ বৎসরের একটি ছেলে, নাম তার গাবলু, সে ভাবল আবদুল কাকা তো দুই-এর বেশী গুণতে জানে না, তাহলে আমি যদি সাতটা গুলি নিয়ে নি তাহলে আবদুল কাকা কিছুই বুঝতে পারবে না। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ, সঙ্গে সঙ্গে সাতটা গুলি চুরি করে নিল।

আবদুল কাকা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলো কে যেন তার গুলি চুরি করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আবদুল কাকা গাবলুকে ধরে ফেলল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম আবদুল কাকা কি করে বুঝল যে তার গুলি চুরি গেছে? কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। শেষে আমি আবদুল কাকাকেই জিজ্ঞাসা করলাম। জিজ্ঞাসা করতে দেখি যে আবদুল কাকা শুধু ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে। তখন আমার ভীষণ রাগ হলো; ভাবলাম আবদুল কাকার বড্ড ডাঁট্ হয়েছে। অনেকক্ষণ পর হাসি-টাসি থামিয়ে আমায় বলল, "কেন? এতো সোজা ব্যাপার। কি করে বুঝেছিলাম বলছি।"

আবদুল কাকা যা বলেছিল সেইটাই আমি সাজিয়ে লিখছি।

ধরা যাক আবদুল কাকার কাছে ১৭টা গুলি ছিল। ১নং ছবিতে আমি যেরকম করে গুলিগুলোকে সাজাচ্ছি ঠিক সে রকম করেই আবদুল কাকা তার গুলিগুলোকে সাজিয়েছিল। এবং এইভাবেই সে গুলির সংখ্যা মনে রেখেছিল। প্রথমে সে দু দুটো গুলিকে এক একটা দলে ফেলল। কারণ সে তো শুধু দুই পর্যন্ত গুণতে জানতো।

১৭ খানা গুলি

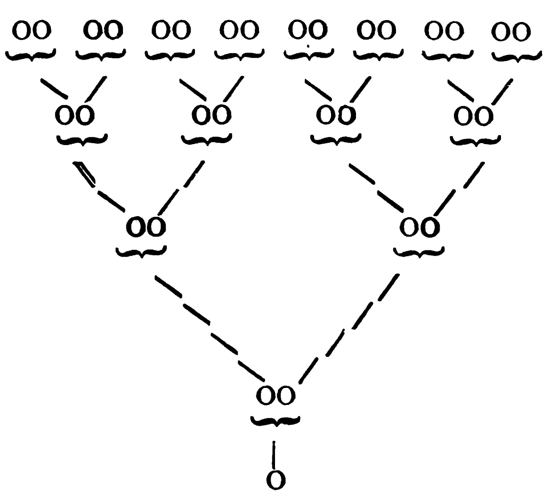

[প্রথম লাইনে ১টা গুলি অবশিষ্ট।]

[দ্বিতীয় লাইনে ০টা গুলি অবশিষ্ট।]

[তৃতীয় লাইনেও ০টা গুলি অবশিষ্ট।]

[চতুর্থ লাইনেও ০টা গুলি অবশিষ্ট]

[পঞ্চম লাইনে ১টা গুলি অবশিষ্ট]

১নং ছবি

তাহলে এবার আমরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি যে আবদুল কাকা এই ১৭টা গুলিকে মনে রেখেছিল।

১০০০১ এই সংখ্যাটি দ্বারা, (পঞ্চম লাইন থেকে প্রথম লাইন অবধি অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি মনে রেখে।) আমাদের এই অদ্ভুত আবদুল কাকার কাছে আমি এরকম নানা ধরনের সংখ্যার কথা শুনেছি। যেমন ধরা যাক—

১০১০। এই সংখ্যাটি দেখলে আমরা কি বুঝি—আমরা বুঝি এক হাজার দশ। কিন্তু আবদুল কাকা যদি ১০১০ এই সংখ্যাটি দেখে তাহলে সে কি বুঝবে?

সে বুঝবে ১০১০ সংখ্যাটিকে এই রকম—

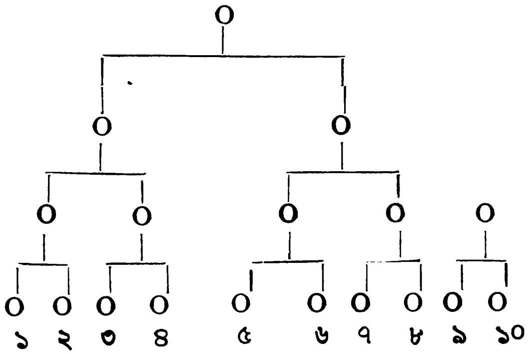

[তৃতীয় লাইনে ১টা গুলি বেশী]

২নং ছবি

আবদুল কাকার কাছে ১০১০ এই সংখ্যাটিই আসল মানে। আর আমাদের কাছে এর আসল মানে হচ্ছে দশ।

আরও অনেক ধরনের উদাহরণ দেওয়া গেল। যেমন ২৫ এই সংখ্যাটিকে আবদুল কাকা কিভাবে লিখবে?

সে লিখবে—১১০০১

এবার আমি কিভাবে এই সংখ্যাটি বার করা হয়েছে তার পদ্ধতিটি দেখাচ্ছি।

২৫

২ | ২৫
২ | ১২............১
২ | ৬ ....০
২ | ৩ ....০
    ১ ....১ ↑

∴ এবার যদি পিছন দিক দিয়ে লিখি তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১১০০১।

হয়তো বা অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ১১০০১ এই সংখ্যাটির আসল মানে যে ২৫ তা আমরা কি করে বুঝবো? অনেকে অবশ্য আমার প্রথম নিয়মটা দেখে মিলিয়ে নিতে পার। কিন্তু যাই হোক ১১০০১ এই সংখ্যাটির আসল মানে যে ২৫ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

১১০০১—

প্রথম সংখ্যাটি আছে ১, সুতরাং প্রথম লাইনে এক-খানা বল আঁকব। যেহেতু সে দুই পর্যন্ত গুণতে জানে সেই কারণে দ্বিতীয় লাইনে এই একখানা বল থেকে দুখানা বল আঁকব। অথচ ১১০০১-এর মধ্যে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি আছে ১। তাই দ্বিতীয় লাইনে আরও একটা বল যোগ করব। এবার দ্বিতীয় লাইনে বলের সংখ্যা হল তিন।

এবার আমরা তৃতীয় লাইনে এই তিনটি বল থেকে প্রত্যেকটিতে দুটি করে বল বা মোট ছয়টি বল আঁকব। যেহেতু তৃতীয় সংখ্যাটি শূন্য তাই মোট বলের সংখ্যা ছয়ই থাকবে।

চতুর্থ সংখ্যাটিও শূন্য। তাই চতুর্থ লাইনে ছয়টি বল থেকে বারটি বল আঁকব এবং চতুর্থ সংখ্যাটি শূন্য বলে এখানেও কোন বল যোগ করব না।

অতএব চতুর্থ লাইনে বলের সংখ্যা দাঁড়াবে বারটি। পঞ্চম সংখ্যাটি হচ্ছে এক, তাই পঞ্চম লাইনে একটা বল বেশী যোগ করব। তাহলে পঞ্চম লাইনে বলের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫।

এবার এঁকে দেখান গেল।

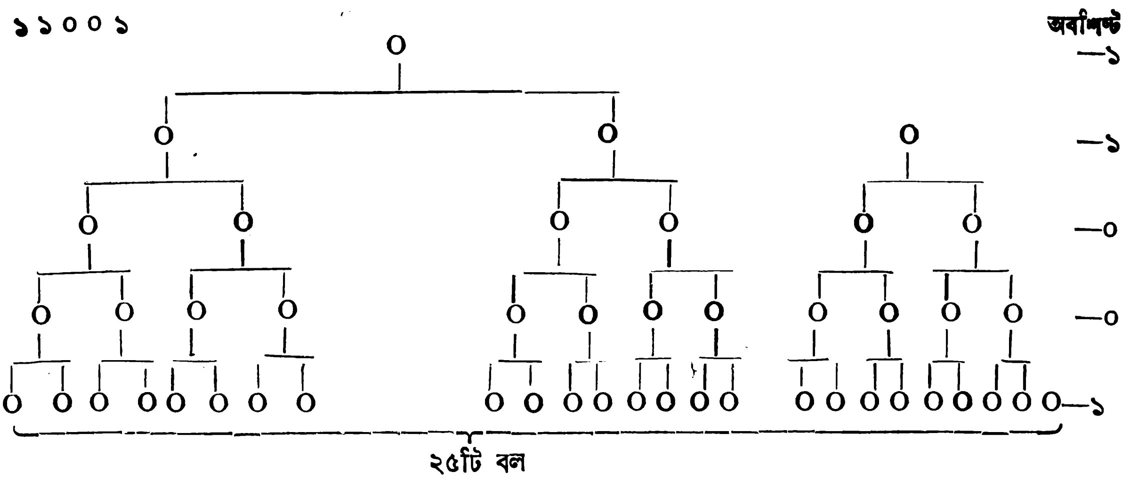

৩নং ছবি

আরও উদাহরণ দেওয়া গেল।

সংখ্যা—১১১

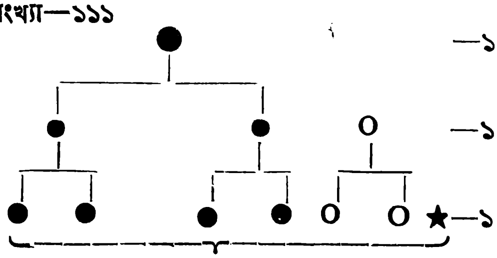

৭টি বল

৪নং ছবি

প্রথম ● বলটি দুবার দ্বিগুণ হয়েছে, O বলটি এক বার দ্বিগুণ হয়েছে। আর ★ বলটি একবারও বাড়েনি।

∴ ১×২×২+১×২+১×১

=১×২²+১×২¹+১×২° (যেহেতু যে কোন সংখ্যায় ঘাত শূন্য হলে তার মান হয় ১। অথাৎ, ২°=১)

=৪+২+১

=৭

আমাদের হিসাবে ১১১ এই সংখ্যাটির আসল মানে ৭।

আমরা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে জানি। এবং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি আলাদা আলাদা চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করি। কিন্তু যখন ১০ এই সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করতে যাই তখনি আমরা সেই প্রথম সংখ্যা একে লিখি এবং তার পিঠে একটা শূন্য বসিয়ে দিই। ধরো আবার যখন ২০ লিখি তখন সেই দুই-এর পিঠে একটা তিন বসিয়ে দিই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলির দ্বারাই আমরা সব সংখ্যাগুলি লিখে থাকি। তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আমরা আসলে ১ থেকে ১০ পর্যন্তই জানি। ঠিক তেমনি আবদুল কাকাও শুধু দুই পর্যন্ত গুণতে জানতো বলেই সে এক-এর পিঠে একটা শূন্য বসিয়ে দিয়ে দুই লিখতো।

আমরা যখন ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ লিখব, তখন আবদুল কাকা এগুলোকে লিখবে এইভাবে—

২ —— ১০
৩ —— ১১
৪ —— ১০০
৫ —— ১০১
৬ —— ১১০
৭ —— ১১১
৮ —— ১০০০
৯ —— ১০০১
১০ —— ১০১০

এবার দেখ আবদুল কাকা কি করে যোগ করত—

```
  ১১১১
+ ১১১১
------
 ১১১১০
```

কিন্তু আমরা এই যোগটাকে যদি আমাদের হিসাবে যোগ করি তাহলে এর যোগফল দাঁড়ায়—২২২২

```
২ | ২
    ১…০

২ | ৩
    ১…১

২ | ৪
 ২ | ২…০
     ১…০

২ | ৫
 ২ | ২…১
     ১…০

২ | ৬
২ | ৩ · ০
    ১…১

২ | ৭
২ | ৩…১
    ১…১

২ | ৮
 ২ | ৪…০
  ২ | ২…০
      ১…০

২ | ৯
 ২ | ৪…১
  ২ | ২…০
      ১…০

২ | ১০
 ২ | ৫…০
  ২ | ২…১
      ১…০
```

আবদুল কাকার যোগ করার নিয়মটা এইরকম—

প্রথমে ওপরের সংখ্যাদুটোর ডান দিকের ১ দুটোকে আমাদের নিয়মে যোগ করলে পাই ২, কিন্তু আবদুল কাকার নিয়মে ২-কে লেখা হয় ১০ দিয়ে।

সুতরাং, ১+১=১০। ১০-এর শূন্য প্রথমে বসল, হাতে রইল এক। তারপর ঠিক সাধারণ ভাবেই হাতের ১টা সংখ্যাদুটোর পাশের ১ দুটোর সঙ্গে যোগ করলে হচ্ছে—(১+১)+১=১০+১=১১। ১১-এই সংখ্যাটির

১ বসল, হাতে রইল ১ এবং ঠিক এইরূপ ভাবেই পরের সংখ্যাগুলি যোগ করতে হবে।

আরও উদাহরণ দেওয়া গেল—

```
    ১১১১… | …১৫
    ১১১১… | …১৫
    ১০১১… | …১১
+   ১০০১… | … ৯
  ১১০০১০  |  ৫০
```

যোগের উল্টো পদ্ধতি বিয়োগের ছোট একটা নমুনা দেখাচ্ছি এবার—

```
   ১০০১… | …৯
–   ১১০… | …৬
     ১১… | …৩
```

ভাগ

```
         ৬
         ↑
১১ ) ১১০ ( ১০→২
↓    ১১
৩     ০

         ২১
         ↑
১১ ) ১০১০১ ( ১১১→৭
↓    ১১
৩    ১০০
      ১১
       ১১
       ১১
```

গুণ :—

```
    ১১… | …৩
×   ১১… | …৩
    ১১  |  ৯
   ১১×
  ১০০০

  ১০০০… | …৮
   ১০০… | … ৪
  ০০০০  |  ৩২
 ০০০০×
১০০০×
১০০০০০
```

এই ১ আর ০ দিয়ে সংখ্যা লেখার পদ্ধতিকে বাইনারি পদ্ধতি বলে।

৩৯-ডি/১, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-৫৪

ভেবে উত্তর দাও

শুভেন্দু ভট্টাচার্য

১। প্লুটো সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে একবার প্রতি—

(ক) ৪৮ বছরে। (খ) ১৪৮ বছরে। (গ) ২৪৮ বছরে।

২। যে গ্রহটি সৌরজগতের কক্ষপথের সবশেষে অবস্থান করে, সেটি হল :—

(ক) প্লুটো, (খ) নেপচুন, (গ) ইউরেনাস।

৩। বৃহস্পতি-গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা হল :—

(ক) নয়টি, (খ) পাঁচটি, (গ) বারটি, ।

৪। মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করে :—

(ক) ১৯৬৭ সালে। (খ) ১৯৬৯ সালে। (গ) ১৯৬৮ সালে।

৫। চাঁদের ওজন হল পৃথিবীর :—

(ক) $\frac{১}{৭১}$ গুণ, (খ) $\frac{১}{৮১}$ গুণ, (গ) $\frac{১}{৯১}$ গুণ।

৬। মানুষের মধ্যে প্রথম যিনি চাঁদে পদক্ষেপ করেন তাঁর নাম :—

(ক) ইউরি গ্যাগারিন। (খ) নীল আর্মষ্টং। (গ) এডউইন অলড্রিন।

৭। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল :—

(ক) ৩৮৪, ৩৯৭ কি.মি. (খ) ২,৪০, ২৫০ কি. মি. (গ) ৪,২৪, ৫০০ কি. মি.।

৮। "আর্যভট্ট" হল তার নাম :—

(ক) ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি।

(খ) ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

(গ) ভারতের শেষ স্পেস রকেট।

৯। যে স্পেসশিপটি মানুষকে প্রথম চাঁদে বহন করে নিয়ে যায়, সেটির নাম হল :—

(ক) স্পুটনিক—১। (খ) অ্যাপোলো—২। (গ) পাওনিয়ার—২।

১০। যে স্পেসক্রাফট দুটি লালগ্রহ মঙ্গলে অবতরণ করে, তাদের নাম হল :—

(ক) ম্যারিনার-৯ এবং ম্যারিনার-১০

(খ) ভাইকিং-১ এবং ভাইকিং-২

(গ) পাওনিয়ার-১০ এবং পাওনিয়ার-১১

(ঘ) মার্স ২ এবং মার্স ৩

উত্তর :—১। (গ), ২। (ক), ৩। (গ), ৪। (খ), ৫। (খ), ৬। (খ), ৭। (ক), ।(খ), ৯। (খ), ১০। (খ), ।

৩৮নং-নন্দনা পার্ক, কলিকাতা-৩৪।

রহস্যময় নিরুদ্দেশ

সিদ্ধার্থ ঘোষ

ছিল একটা বেড়াল। হয়ে গেল একটা রুমাল। কি কাণ্ড! এরকম হয় নাকি? তোমরা বলবে কখনো না—ওটা শুধু সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'-তেই হয়। আজব দেশে আজব কাণ্ড ঘটতে পারে তা বলে সত্যি সত্যিই তা কখনো হয় না। বেশ, বেড়াল থেকে রুমাল না হয় হল। কিন্তু যদি বলি ছিল একটা বেড়াল তারপরেই দেখি কিছু নেই। চোখের সামনে থেকে হাওয়া। তাও চোখের পলক অবধি পড়েনি। এটা কি হতে পারে? এই আছে, এই নেই? না না, কত জোরে ছুটবে। সেটাও তে তাহলে চোখে পড়ত। কি বললে, অসম্ভব! কিন্তু রহস্য গল্পে যখন মানুষ অবধি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তখন তো তোমরা অসম্ভব বলো না! হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে কল্পবিজ্ঞানের গল্প ছাড়া অন্য কোথাও কোনো মানুষ কারুর চোখের সামনে থেকে দুম্ ক'রে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু আমি তোমাদের সব কথাই ভুল বলে দেখিয়ে দিতে পারি। একটু ধৈর্য ধরো না,

এটা কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়, হ-য-ব-র-ল-এর উল্টোপাল্টা জগতের কাণ্ড নয়, রহস্য গল্পের ব্যাপারও নয়। রঙীন কাগজে ছাপা ওপরের ছবিটা দেখতে পাচ্ছ? ক'টা লোকের মুখ রয়েছে গুণে দেখতো। হ্যাঁ—ছ'টা। এবার ছবিটাকে ডট্-ডট্ লাইন বরাবর মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দুটো টুকরো করে ফেলো। হয়েছে তো? এবার এই কাটা টুকরো দুটো কি এমন ভাবে সাজাতে পার যাতে একটা মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়? না, না, মোটেই অসম্ভব নয়। যদি করতে না পারো তবে ডিসেম্বর সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতাতেই দেখতে পাবে কিভাবে ছ'টা মুখ চোখের পলকে পাঁচটা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পাঁচটা মুখকেও আবার নেড়ে চেড়ে ছ'টা করে দেওয়া যাবে। ভয় পাওয়ার কারণ নেই কোনো। রহস্যময় নিরুদ্দেশ ঠিকই তবে আজগুবি কিছু নয়। জ্যামিতির খেলা। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড তো বিজ্ঞানের জগতেই ঘটে।

ছবি ঃ সমীর মণ্ডল

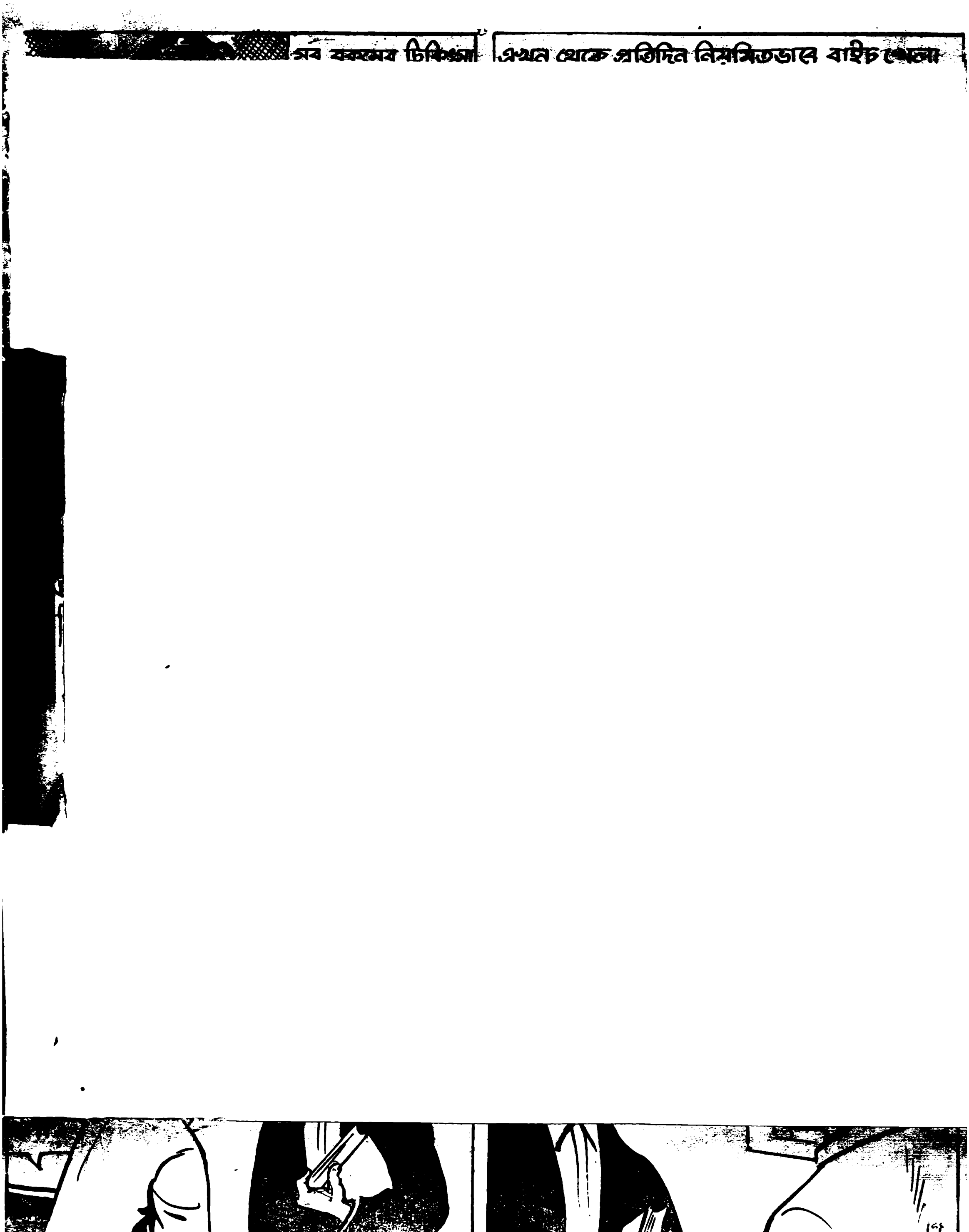
সব রকমের চিকিৎসা
এখন থেকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বাইচ

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • Oct-Nov 1982 Regd No WBCC/50

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২